শহীদে কারবালা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)

ছারছীনা প্রকাশনী-ঢাকা

শহীদে কারবালা

মূল
মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)

অনুবাদক
মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী

প্রাপ্তিস্থান

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
পোঃ দারুচ্ছুন্নাত
জিলা- পিরোজপুর

ছারছীনা প্রকাশনী
৪০/৪১, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

যার আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহ আমার জীবনকে সার্থক করেছে সে প্রিয় ব্যক্তিত্ব দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জনাব আলহাজ্জ মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানকে এ বইখানা উৎসর্গ করলাম।

মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী
তাং ০৮/০৪/২০০৬ ইং

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ওলীয়ে কামেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ ছাহেব হুযুরের

দোয়াপত্র

কারবালার ইতিহাস অত্যান্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। এ কারবালার ঘটনার মধ্যে রয়েছে গোটা মুসলমানের জন্য এক মহান শিক্ষা। কারবালার উপর অগণিত বই পুস্তক প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ের উপর নির্ভরযোগ্য ও তথ্যভিত্তিক পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ) "শহীদে কারবালা নামে একখানা উর্দূ কিতাব প্রণয়ন করেছেন। যে কিতাবখানা নির্ভরযোগ্য ও বাংলা অনুবাদ করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। বইখানা ছারছীনা প্রকাশনীর মালিক জনাব আলহাজ্জ লুৎফুল আলম তাঁর প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন ফলে আমি অত্যান্ত খুশী হয়েছি।

দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা অনুবাদকের এই খেদমতটুকু কবুল করুন এবং প্রকাশককে তার প্রকাশনার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দিন।

আমীন!

দোয়াগো
তাং ০৮/০৪/২০০৬ ইং

অনুবাদকের আরজ

কারবালার শাহাদাতের ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীগণ কারবালা প্রান্তরে যে শাহাদাত বরণ করেছেন, তা গোটা মুসলিম জাতির জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা।

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান চালু করা, খেলাফতে নববীর ধারাবাহিকতা জারী রাখা এবং ইসলামী ইনসাফ কায়েম করার জন্যই হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীগণ শাহাদত বরণ করেছেন। এই শাহাদত ছিল, অত্যন্ত করুণ ও ব্যথাতুর। এই নিষ্ঠুর ঘটনার কথা স্মরণ করলেও প্রতিটি মানুষের অন্তর শিউরে ওঠে। হযরত হোসাইনের (রা) এই শাহাদতের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের জন্য এক দিক নির্দেশনা।

হযরত হোসাইন (রা) জানতেন যে, এজিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেই তিনি ও তাঁর সাথীগণ প্রাণে রক্ষা পাবেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি পার্থিব সম্পদের অনেক মালিক হবেন। পাবেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মান। কিন্তু তিনি এই সবগুলো সত্যের মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি চিন্তা করলেন, আজ যদি আমি পার্থিব সম্পদের মোহে ঢলে পড়ি, তবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। খেলাফতে নববীর পরিবর্তে এসে যাবে বাদশাহী ও আমিরী খেলাফত। না, তা হতে পারে না, আমার প্রাণ যাবে তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে আমার সামনে মুছে যেতে দেব না। তিনি কোন জনবলের চিন্তা করলেন না, কোন শক্তির পরোয়া করলেন না, একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে দুশমনদের মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করলেন। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর শাহাদতের মাধ্যমে গোটা মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন যে, মুমিন কোনদিন জয়-পরাজয়ের চিন্তা করে না, পরোয়া করে না কোন শক্তির। সে অন্যায়ের মোকাবিলায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ঝাপিয়ে পড়ে। পরিণাম আল্লাহর কুদরতি হাতে। যা হবে, তাতেই মুমিন খুশী থাকবে ও আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

কারবালার ঘটনার ওপর অসংখ্য পুস্তিকা প্রণীত হয়েছে। অনেক পুস্তকই আমি পড়েছি। কিন্তু বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফতী, আল্লামা মাওলানা শফী সাহেব (রহ)-এর প্রণীত উর্দু পুস্তক 'শাহাদতে কারবালা' বইখানি পড়ে কারবালার ঘটনা আমার কাছে যেভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে, অন্য আর কোন পুস্তক দ্বারা তা হয়নি। তিনি তার ক্ষুদ্র পুস্তকে, গোটা কারবালার কাহিনী সংক্ষিপ্ত ভাবে, অতি সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যাতে সাধারণ মানুষেরা বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি, হযরত হোসাইনের (রা) যুদ্ধ করার কারণ অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে হযরত হোসাইন (রা) সম্পর্কে কোন মানুষ এই সন্দেহ পোষণ করতে না পারে যে, তিনি নেতৃত্ব ও রাজত্বের জন্য এই মোকাবিলা করেছিলেন (নাউজবিল্লাহ)। আল্লাহ লিখককে জাযায়ে খাইর দান করুন।

আমি এ কারণেই বইটির বাংলা অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পেশ করেছি। যাতে তারা কারবালার প্রকৃত ঘটনা ও হযরত হোসাইনের (রা) আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়, তাই পাঠকগণের খেদমতে আরয, আমার অনুবাদে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, আমাকে অবহিত করে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব, ইনশাআল্লাহ।

এই অনুবাদ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে যিনি বইটি প্রকাশ করে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার জন্য ও আমি গুনাহগারের জন্যও পাঠকগণের খেদমতে দোয়ার দরখাস্তও রইলো।

আরয গুযার
মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী
নেছারাবাদ, ঝালকাঠী

'বায়তুল আরিফ'
০১/০৭/ ২০০৫ ইং

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, যিনি অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা ও সর্বশ্রষ্টা। সালাত ও সালাম সৃষ্টির সেরা, সু-সংবাদক বাহক নূর নবী জনাব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের (রা) ওপর। জান্নাতী যুবকদের সর্দার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক শাহাদতের ঘটনা এমন নয় যে, যা কারও অন্তর থেকে কখনও মুছে যেতে পারে। শুধু মুসলমানই নয় বরং প্রতিটি মানুষই এই শাহাদতের করুণ ঘটনায় আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। এই শাহাদতের ঘটনায়, চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ। কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য পুস্তক বের হয়েছে। কিন্তু সে পুস্তকগুলোর মধ্যে অনেক পুস্তক এমনও রয়েছে যার বর্ণনা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য নয়।

এ কারণে, আমার অনেক বন্ধুরা দীর্ঘদিন থেকেই কারবালার ঘটনার ওপর একখানা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত পুস্তক লেখার জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করে আসছেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে বন্ধুদের এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ 'উসওয়ায়ে হোসাইনী' (হোসাইন রা-এর আদর্শ) এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ হলো। এ উদ্দেশ্যে কলম হাতে নিলাম। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়েও এ বিষয়ের ওপর একখানা আলাদা পুস্তক হয়ে গেল। আল্ হামদুলিল্লাহ! এতে আমার বন্ধুদের ইচ্ছাটিও পূর্ণ হলো।

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রচেষ্টাটুকু মেহেরবানী করে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

আহ্কার
বান্দাহ্ মুহাম্মদ শফী।
'লাইলাতুল আশুরা'
১৩৭৫ হিজরী।

সূচীপত্র

কারবালার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা, জান্নাতী যুবক হযরত হোসাইন রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক ও নৃশংস শাহাদত, আকাশ ও পৃথিবীর গোটা সৃষ্টিকে ব্যথিত ও প্রভাবান্বিত করেছে। এমন কোন মানুষ-বিশেষ করে কোন মুসলমান নেই, যার অন্তরে এই শাহাদতে দাগ কাটেনি। আর পৃথিবীর বুকে এমন একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি কোন কালে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ভুলে যেতে পারেন। কারবালার শহীদী আত্মা আজ শুধু তাদেরকেই স্মরণ করছে, যারা তাঁর বেদনায় শরীক এবং তাঁর আদর্শের অনুসারী।

যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হযরত হোসাইন (রা) পেরেশান হয়ে মদীনা থেকে মক্কা, অতঃপর মক্কা থেকে কুফা যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁর নিজ আদরের সন্তান ও পরিবার-পরিজনদেরকে কোরবান করে, পরিশেষে নিজেও কোরবান হয়ে গিয়েছিলেন, সেই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, কারবালার শহীদী আত্মা আজ পৃথিবীর মুসলমানদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। শাহাদতের সার্বিক ঘটনা এবং হযরত হোসাইনের (রা) পত্রাবলি ও বক্তব্যসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত হোসাইনের (রা) উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. কুরআন ও সুন্নাহর বিধান যথাযথভাবে চালু করা।
২. সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ইনসাফ কায়েম করা।
৩. খেলাফতে নববীর পরিবর্তে বাদশাহী খেলাফত প্রবর্তনের মোকাবিলায় জিহাদ করা।
৪. সত্যের মোকাবিলায় কোন ব্যক্তির সামনে ভীত না হওয়া।
৫. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন, সন্তান-সন্তুতি এবং ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে দেয়া।
৬. ভীষণ মসিবতের সময় পেরেশান না হওয়া। সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা।

এমন কে আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কলিজার টুকরা, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গকারী, মজলুম মুজাহিদ, শহীদ হযরত হোসাইনের (রা) আহ্বান শুনে, তাঁর মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক ভাবে প্রস্তুত এবং তাঁর আদর্শের অনুসারী হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ?

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে, আপনার ও আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এবং সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনদেরকে ভালবাসার ও তাঁদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কারবালার শহীদ (রা)

পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের জন্য এক শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত। এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করে, যা অন্য আর কোন শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা লাভ করা যায় না। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন জাতির পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা ভাবে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।

জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের ঘটনা শুধু ইসলামের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। বরং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে, এই শাহাদতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে। কারবালার এই শাহাদতে, একদিকে যেমন অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, নিলর্জ্জতা ও অকৃতজ্ঞতার বিস্ময়কর ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে আবার পরিলক্ষিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কলিজার টুকরা হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথী ৭০-৭২ জনের একটি ক্ষুদ্র দলের বাতিলের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থেকে স্বীয় জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়ার অনন্য ঘটনা। যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া খুবই দুষ্কর। আর উপরোল্লিখিত এ দুটি দিকের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে পরবর্তী বংশধরদের জন্য হাজারো দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা।

কারবালার ঘটনার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ঘটনার ওপর অজস্র পুস্তক-পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত হয়েছে। কিন্তু অনেক পুস্তকের বর্ণিত ঘটনা ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনার সংমিশ্রণ রয়েছে। আমি এ পুস্তকে বিশুদ্ধ বর্ণনাসহ কারবালার শাহাদতের ঘটনা পেশ করতে চেষ্টা করেছি। কারবালার ঘটনা এক মহা সমুদ্র রক্ত। যার মধ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। কারবালার হৃদয়বিদারক

ঘটনা লিখতে এবং স্মরণ করতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। আমি এই হৃদয়স্পর্শ শাহাদতের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করতে চেষ্টা করছি। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দান করুন। —আমীন।

ইসলামী খেলাফতে এক মহা দুর্ঘটনা

হযরত ওসমানের (রা) শাহাদত থেকেই মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ফিত্না শুরু হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং সরলমনা মুসলমানদের আবেগ সম্বলিত অনেক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। নবীগণের পরে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বস্বীকৃত, সেই মুসলমানগণ নিজেরাই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ইসলামী খেলাফতের পরম্পরা যখন আমির মুয়াবিয়া (রা) পর্যন্ত এসে পৌছে, তখন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে 'খেলাফতে রাশেদার'[১] সেই রূপ অনুপস্থিত থাকে, যে রূপ নিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন[২] রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) পরামর্শ দেয়া হলো যে, এ যুগটি ভীষণ ফিত্নার যুগ। আপনি আপনার পরবর্তী সময়ের জন্য এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে যান, যাতে আপনার পরে আবার মুসলমানগণ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে না পড়ে এবং ইসলামী খেলাফত (রাজত্ব) খন্ড-বিখন্ড না হয়ে যায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সময় এ প্রস্তাবটি অযৌক্তিক ও অমূলক ছিল না। কিন্তু এই পরামর্শ দাতাগণ, সাথে সাথে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) পুত্র ইয়াযীদের নাম তাঁর কাছে পেশ করলেন। কুফা থেকে চল্লিশ জন মুসলমান মুয়াবিয়ার (রা) কাছে এসে আবেদন করলেন যে, আপনার পরে এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খলীফা হিসেবে আপনার পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি অন্য আর কাউকে দেখছি না। তার খেলাফতের ওপর আপনি বাইয়াত গ্রহণ করুন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রথমে এ প্রস্তাবটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শে বসলেন। এই পরামর্শ বৈঠকে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ এ প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। কেউ এর বিরোধিতা করলেন। ইয়াযীদের অন্যায় আচরণগুলো তখন পর্যন্ত সবার কাছে অপ্রকাশিত ছিল। অবশেষে বৈঠকে ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

টিকাঃ

১. খেলাফতে রাশেদাঃ রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোধান পরবর্তী খলীফা চতুষ্টয়ের শাসন কাল।
২. খোলাফায়ে রাশেদীন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা চতুষ্টয়।

ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত

সিরিয়া ও ইরাকে কিভাবে এই বাইয়াতের খবর গিয়ে পৌছল, তা জানা যায় নি। সেখানের লোকেরা ইয়াযীদের হাতে বাইয়াতের বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুব আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। আর এদিকে প্রচার করে দেয়া হলো যে সিরিয়া, ইরাক, কুফা ও বসরার লোকেরা ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে গেছেন।

মক্কা ও মদীনার গর্ভনরকে ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো। মদীনার গভর্নর ছিলেন মারওয়ান। তিনি খুতবা দিলেন এবং লোকদেরকে বললেন, "আমীরুল মুমেনীন মুয়াবিয়া (রা), হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) পদ্ধতি অনুযায়ী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর পরিবর্তে খলীফা হিসেবে তাঁর পুত্র ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করাবেন।"

এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে মারওয়ান। আপনার এই বক্তব্য সত্য নয়। হযরত আমীর মুয়াবিয়া যেটি চাচ্ছেন, এটি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) পদ্ধতি নয়। বরং এটি পারস্য ও রোম সম্রাটের পদ্ধতি। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) তাঁরা তাঁদের পুত্রদের জন্য বাইয়াত নেননি এবং তাঁদেরকে খেলাফতের দায়িত্বও প্রদান করে যাননি। এমনকি তাঁদের গোত্রের কাউকেই তাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করেননি। খলীফা হিসেবে হিজাজের[৩] সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি ছিল 'আহলে বাইতের'[৪] ওপর। বিশেষ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কলিজার টুকরা হযরত হোসাইনের (রা) ওপর। যাকে তাঁরা (হিজাজবাসীগণ) হযরত মুয়াবিয়ার পরে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্যতম খলীফা হিসেবে মনে করতেন। হিজাজবাসীগণ এ ব্যাপারে হযরত হোসাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন যে, তাঁরা এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লিখিত সাহাবাগণের সামনে প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহ্র এই বিধান সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান যে,

টিকাঃ

৩। হিজাজ ঃ মক্কা, মদীনা ও তায়েফের এলাকা।
৪। আহলে বাইত ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজন।

ইসলামী খেলাফত হচ্ছে খেলাফতে নবুওয়াত। এই খেলাফতে উত্তরাধিকারীদের কোনই অধিকার নেই যে, পিতার পরে তাঁর পুত্র খলীফা হবে। বরং এখানে যেটা অতি প্রয়োজন, তা হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে খলীফা মনোয়ন করা। দ্বিতীয়ত তাঁদের মতে, ইয়াযীদের ব্যক্তিগত চরিত্রের কারণে তাকে গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফারূপে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ কারণে, উল্লিখিত সাহাবাগণ (রা) এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। আর অধিকাংশ সাহাবাগণ (রা) তাঁদের ওফাত পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন। তাঁদের এই সত্য কথা বলা এবং ন্যায়ের সহায়তা করার কারণেই মক্কা, মদীনা এবং কুফা ও কারবালার রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংঘটিত হয়।

মদীনায় হযরত মুয়াবিয়া (রা)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) হিজরী একান্ন সনে, নিজেই মদীনা শরীফ আগমন করেন। তাঁর সাথে উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা) সাথে এ বিষয় আলোচনা হয়। সবাই প্রকাশ্যে ইয়াযীদের খেলাফতীর ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) কাছে উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা) ব্যাপারে এই বলে অভিযোগ পেশ করেন যে, তাঁরা আমার বিরোধিতা করছেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে বললেন, "আমি তো শুনেছি আপনি নাকি আপনার মত মেনে নেয়ার জন্য তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁদেরকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। এরূপ কাজ থেকে আপনার অবশ্যই, বিরত থাকা উচিত।" হযরত মুয়াবিয়া (রা) বললেন, "আপনি যা শুনেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। উল্লেখিত সাহাবাগণ (রা) আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। তাঁদের সাথে আমি কখনই এরূপ আচরণ করতে পারি না। কিন্তু কথা হলো, যেখানে সিরিয়া ও ইরাকসহ গোটা ইসলামী দেশের লোকেরা ইয়াযীদের বাইয়াতের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন, সেখানে এখন শুধু এই কতিপয় সাহাবা (রা) বিরোধিতা করছেন। এখন আপনিই বলুন, যেখানে মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে এক ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে সমর্থন করছেন এবং তার হাতে বাইয়াতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানে কি আমি তাদের এই সম্মিলিত রায়কে বাতিল করে দিতে পারি ?

উম্মুল মুমেনীন (রা) বললেন, "আপনি কি সিদ্ধান্ত নিবেন, সেটা আপনিই জানেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। তবে আপনার প্রতি আমার কথা হলো, আপনি উল্লিখিত সাহাবাগণের (রা) প্রতি কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করবেন

না। অত্যন্ত সম্মান ও সহানুভূতির সাথে তাঁদের সাথে কথা বলবেন।" হযরত মুয়াবিয়া (রা) উম্মুল মুমেনীনের (রা) কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, "আমি তাঁদের সাথে সম্মান রক্ষা করেই কথা বলবো।" (ইবনে কাসীর)

হযরত হোসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) বুঝতে পারলেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) মদীনায় থাকা অবস্থায়ই তাঁদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করবেন। এ কারণে তাঁরা পরিবার-পরিজনসহ মদীনা শরীফ ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরও (রা) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন।

মক্কায় হযরত মুয়াবিয়া (রা)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। এখানে এসে তিনি প্রথমেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডেকে এনে বললেন, "হে চাচার পুত্র! তুমিই তো আমার কাছে বলেছিলে যে, আমীর ব্যতীত একটি রাতও অতিবাহিত করা আমার কাছে অপমানীয়।" এ আলোকেই, আমি আমার পরবর্তী কালের জন্য ইয়াযীদের খেলাফতীর ওপর বাইয়াত নিচ্ছি। যাতে আমার পরে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হতে পারে। আমার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সব মুসলমান ঐকমত্য হয়েছেন। কিন্তু আমি শুনে বিস্মিত হলাম যে, আপনি নাকি এর বিরোধিতা করছেন। আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, মুসলমানদের এই ঐকমত্যে আপনি ফাটল ধরাবেন না, আর কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি করারও চেষ্টা করবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা) জবাব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন। অতঃপর হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "আপনার পূর্বেও অনেক খলীফা ছিলেন এবং তাঁদেরও পুত্র সন্তান ছিল। তাঁদের পুত্রদের চেয়ে আপনার পুত্র কোন দিকে দিয়েই উত্তম নয়। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পুত্রদের ব্যাপারে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেননি, যেরূপ সিদ্ধান্ত আপনি আপনার পুত্রের ব্যাপারে নিচ্ছেন। বরং তাঁরা মুসলমানদের সম্মিলিত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (অর্থাৎ খলীফা মনোয়নের বিষয়টি মুসলমানদের ঐকমত্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন)। আপনি আমাকে মুসলমানদের পারস্পিরক বিচ্ছিন্নতার ভয়

প্রদর্শন করছেন ? আপনি জেনে রাখুন! আমি কখনই মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াব না। আমি মুসলমানদেরই একজন। যদি সব মুসলমান কোন বিষয়ের ওপর ঐকমত্য হয়ে যান, তবে আমিও সে মতকে আন্তরিকভাবে মেনে নিব।" অতঃপর আমীর মুয়াবিয়া (রা) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের (রা) সাথে এ বিষয় আলোচনা করেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বললেন, আমি এ প্রস্তাব কখনই সমর্থন করি না। এর পরে আমীর মুয়াবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে (রা) ডেকে এ প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন।

হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) পরামর্শ

অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) কতিপয় সাহাবা (রা) সহ হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে, বললেন যে, আপনার জন্য এটা কোনভাবেই শোভনীয় নয় যে, আপনি আপনার পুত্র ইয়াযীদের বাইয়াতের ব্যাপারে সবার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। আমরা আপনার কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। যেগুলো আপনার পূর্ববর্তী খলীফাদের পদ্ধতি।

১. আপনি সে পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ের জন্য কাউকে খলীফা মনোয়ন করে যাননি। বরং মুসলমানদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

২. অথবা সে পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যা করেছেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি খলীফা হিসেবে এমন এক ব্যক্তির নাম পেশ করেছেন, যিনি তাঁর বংশের ছিলেন না এবং নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যেও ছিলেন না। আর সেই প্রস্তাবিত ব্যক্তির যোগ্যতার ব্যাপারে সব মুসলমান একমত ছিলেন। কারও কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

৩. অথবা আপনি সে কাজ করুন, যা করেছিলেন হযরত ওমর (রা)। তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ের খলীফা মনোয়নের বিষয়টি ছয় ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

উল্লিখিত তিনটি পথ ব্যতীত অন্য আর কোন পথই আমরা মেনে নিব না। কিন্তু আমির মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর অটল রইলেন। তিনি বললেন, ইয়াযীদের বাইয়াতের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন এর বিরোধিতা করা আপনাদের জন্য ঠিক হবে না।

হিজাজবাসীদের ইয়াযীদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) জীবদ্দশায়ই সিরিয়া ও ইরাকের জনগণ ইয়াযীদের বাইয়াতকে গ্রহণ করে নিলেন। অন্যান্য সাহাবাগণ যখন দেখলেন যে, বৃহৎ একটি দল ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা মুসলমানদেরকে পারস্পরিক বিশৃংখলা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ইয়াযীদের বাইয়াতকে মেনে নিলেন। কিন্তু মদীনাবাসী, বিশেষ করে হযরত হোসাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ইয়াযীদের বাইয়াতকে কোনভাবেই মেনে নিলেন না। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর অটল রইলেন। তাঁরা নির্বিঘ্নে অকুতোভয়ে এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, "ইয়াযীদ মুসলমানদের খলীফা হওয়ার একবারেই অযোগ্য। তার মধ্যে এমন কোন যোগ্যতা নেই, যাতে সে মুসলমানদের খলীফা হতে পারে।" এ পরিস্থিতির মধ্যেই হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলো।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ওফাত ও অসিয়ত

ওফাতের পূর্বে হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযীদকে কতিপয় অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করেছিলেন। সে অসিয়তগুলোর মধ্যে একটি অসিয়ত এই ছিল যে, "আমার মনে হচ্ছে, ইরাকবাসী হযরত হোসাইনকে (রা) তোমার মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করবে। যদি এরূপ হয়, আর মোকাবিলায় তুমি যদি বিজয়ী হও, তবে হযরত হোসাইনকে (রা) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়-স্বজনকে সর্বদাই সম্মান প্রদর্শন করবে। সব মুসলমানদের ওপর তাঁদের অধিকার রয়েছে। *(তারীখে কামেল, ইবনে আসীর ঃ ৪র্থ খন্ড, ১ পৃষ্ঠা)*

ওয়ালীদের নামে ইয়াযীদের পত্র

ইয়াযীদ খেলাফতের আসনে এসেই মদীনার আমীর (গর্ভনর) ওয়ালীদ ইবনে ওকবার কাছে একখানা পত্র লিখলো। পত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"হযরত হোসাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের (রা) ওপর বাইয়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি করুন। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে কোনই সুযোগ দিবেন না।"

ওয়ালীদ এই পত্র পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি খলীফার নির্দেশ কিভাবে পালন করবেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম, যিনি তাঁর পূর্বে মদীনার আমীর (গর্ভনর) ছিলেন, তাঁকে পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এখন পর্যন্ত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ওফাতের সংবাদ মদীনায় এসে পৌছেনি। সুতরাং আপনি এখনই তাঁদেরকে বাইয়াত গ্রহণের জন্য ডেকে আনুন। যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, তবে তো বেশ ভাল কথা। উদ্দেশ্য ও সফল হলো। অন্যথায় তাঁদেরকে এখানেই হত্যা করা হবে। ওয়ালীদ, হযরত হোসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে (রা) ডেকে আনার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে পাঠালেন। সে গিয়ে এ দু'জনকে মসজিদে পেলেন। সে তাঁদের কাছে মদীনার আমীরের নির্দেশ পৌছাল। তাঁরা আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি যাও। আমরা আসছি। তাঁর চলে যাওয়ার পর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হযরত হোসাইনকে (রা) বললেন, এসময় তো আমীরের কোন বৈঠক হওয়ার কথা নয়। এ সময় আমাদেরকে ডাকার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ রহস্য রয়েছে। হযরত হোসাইন (রা) অত্যন্ত তীক্ষ্ম মেধাবী ছিলেন। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, মুয়াবিয়া (রা) ইন্তেকাল করেছেন। এখন ওয়ালীদ চাচ্ছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের খবর মদীনায় প্রচার হওয়ার পূর্বেই ইয়াযীদের খেলাফতীর ওপর বাইয়াত হওয়ার জন্য সে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন।" আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হযরত হোসাইনের (রা) এই কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বললেন, এখন এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত কি ? হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আমি আমাদের যুবকদের সমবেত করে তাঁদেরসহ ওয়ালীদের কাছে পৌছব। যুবকদেরকে দরজার সামনে রেখে আমি ভেতরে চলে যাব। যাতে প্রয়োজনে তাঁদের সাহায্য নিতে পারি। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত হোসাইন (রা) ওয়ালীদের কাছে পৌছলেন। সেখানে মারওয়ানও উপস্থিত ছিল। হযরত হোসাইন ভেতরে প্রবেশ করেই প্রথমে সালাম দিলেন। অতঃপর ওয়ালীদ এবং মারওয়ানকে সম্বোধন করে বললেন, আপনাদের দু'জনার মধ্যে ইতোপূর্বে তো মনের অমিল ছিল। আমি এ মুহূর্তে আপনাদের দু'জনকে একত্রে বসা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের দু'জনার এই সুসম্পর্ক কায়েম রাখুন। অতঃপর ওয়ালীদ, ইয়াযীদের পত্রটি হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পেশ করেন। যে পত্রে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ওফাতের খবর এবং ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত নেয়ার জন্য তাকিদ দেওয়া ছিল। হযরত হোসাইন

(রা) হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করলেন। আর বাইয়াতের ব্যাপারে বললেন, আমার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে নির্জনে বসে গোপনে ইয়াযীদের খেলাফতীর ওপর বাইয়াত হয়ে যাব। সবচেয়ে ভাল এটাই যে, আপনি সকলকে সমবেত করে এই বাইয়াতের বিষয়টি সবার সামনে পেশ করুন। এ সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকব। যা কিছু হবে, সবার সামনেই হবে। ওয়ালীদ একজন শান্তি প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি হযরত হোসাইনের (রা) প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তাঁকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু মারওয়ান হযরত হোসাইনের (রা) সামনেই ওয়ালীদকে বললো, যদি হোসাইন (রা) এ মুহূর্তে আপনার হাত ছাড়া হয়ে যায়, এরপরে কখনই তাঁকে আপনি আপনার কাছে উপস্থিত করতে পারবেন না। আমার অভিমত এই যে, বাইয়াত না হওয়া পর্যন্ত আপনি তাঁকে এখানেই রেখে দিন। তাঁকে কোনভাবেই হাত ছাড়া করবেন না। আর তিনি যদি একান্তই বাইয়াত না হন, তবে তাঁকে হত্যা করে ফেলুন। হযরত হোসাইন (রা) একথা শুনে মারওয়ানকে কঠোর ভাষায় বললেন, "এমন কে আছে, যে আমাকে হত্যা করবে"? এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসলেন। মারওয়ান ওলীদকে এই কথা বলে তিরস্কার করল যে, "আপনি সুযোগ পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না।" ওয়ালীদ বললেন, গোটা পৃথিবীর রাজত্ব ও সম্পদও যদি আমাকে এর বিনিময় দেয়া হয় যে, আমি হযরত হোসাইনকে (রা) হত্যা করব, সেটা কোন দিনই আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিয়ামতের দিন হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার দায়-দায়িত্ব যার ওপর বর্তিবে সে কখনই রক্ষা পাবে না।

হযরত হোসাইন ও হযরত যোবায়েরের (রা) মক্কা গমন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) তাঁর ভাই জাফরকে (রা) সাথে নিয়ে রাতারাতি মদীনা ত্যাগ করলেন। তাঁকে খোঁজ করতে গিয়ে যখন পাওয়া গেল না, তখন হযরত হোসাইনের (রা) তালাশ শুরু হলো। হযরত হোসাইন (রা) তিনিও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে চলে আসলেন। তাঁরা দু'জনেই মক্কা শরীফ পৌছে সেখানে অবস্থান করতে থাকলেন। ইয়াযীদ এই সংবাদ জানতে পেরে মনে করলো যে, এটা ওয়ালীদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণেই ঘটেছে। সে (ইয়াযীদ) ওয়ালীদকে পদচ্যুত করে তাঁর পরিবর্তে আমর বিন সায়ীদকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করলো। আর পুলিশ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করলো আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের (রা) ভাই

আমরকে। ইয়াযীদের জানা ছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের (রা) ও তাঁর ভাই আমরের মধ্যে পারস্পরিক ভীষণ দ্বন্দ্ব ছিল। সুতরাং আমর তার ভাই আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করতে মোটেই ইতস্তত করবে না।

গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ

আমর ইবনে যোবায়ের প্রথমে মদীনার নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের (রা) সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন তাদেরকে ডেকে এনে খুব শাসালো এবং মার পিটের মাধ্যমে তাঁদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করতে চাইলো। অতঃপর আমর বিন সায়ীদের পরামর্শ অনুযায়ী আমর ইবনে যোবায়ের দু'হাজার নওজোয়ান সৈন্যবাহিনীর একটি দল নিয়ে হযরত হোসাইন (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে (রা) গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হলো। আবু হুরায়রা খুযায়ী আমর বিন সায়ীদকে একাজে বাধা দিয়ে বললেন যে, মক্কা শরীফে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি ও খুনা-খুনি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যে লোক মক্কার হরম শরীফে আশ্রয় নেন, সে নিরাপদ। তাকে গ্রেফতারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হবে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের প্রকাশ্য বিরোধিতা করা। কিন্তু আমর বিন সায়ীদ তাঁর কথা শুনল না। সে হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো। (বুখারী)

অবশেষে আমর ইবনে যোবায়ের দু' হাজার সৈন্য বাহিনীর একটি বৃহৎ দল নিয়ে রওয়ানা হলো। মক্কার বাইরে শিবির স্থাপন করে তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের (রা) কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালো যে, "তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য ইয়াযীদ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। মক্কা শরীফের অভ্যন্তরে হত্যাকান্ড ঘটানো আমি পছন্দ করি না। তাই তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করো।"

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) তাঁর কতিপয় নওজোয়ানকে আমরের মোকাবিলার জন্য পাঠালেন। তাঁরা এসে আমরকে পরাজিত করলো। আমর পরাজয় বরণ করে ইবনে আলকামার গৃহে আশ্রয় নিল। অন্যদিকে হযরত হোসাইন (রা) যখন মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হবেন. এসময় আবদুল্লাহ ইবনে মুতীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত হোসাইনকে (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? জবাবে হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আমি এ মুহূর্তে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি। পরে কোথায় যাব, সে ব্যাপারে 'ইস্তেখারা' করে সিদ্ধান্ত নিব। আবদুল্লাহ ইবনে মুতী বললেন, আমি আপনাকে

একটি সুপরামর্শ দিচ্ছি যে, আপনি এ মূহূর্তে মক্কাতেই থাকুন। কোন অবস্থাতেই কুফার দিকে যাত্রা করবেন না। কুফা খুবই খারাপ শহর। সেখানে আপনার সম্মানিত পিতাকে শহীদ করা হয়েছে। আপনার ভাইকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একথায় হযরত হোসাইন (রা) মক্কা প্রত্যাবর্তন করে সেখানে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেলেন এবং মক্কার চার পাশের মুসলমানদের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

হযরত হোসাইনের (রা) কাছে কুফাবাসীর পত্র

কুফাবাসীর কাছে যখন হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ওফাতের খবর পৌছল এবং সাথে সাথে এ খবরও পৌছল যে, হযরত হোসাইন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ ইয়াযীদের বাইয়াতকে প্রত্যাখান করেছেন, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট, সুলায়মান ইবনে সারদ খাযায়ীর গৃহে সমবেত হলেন। তাঁরা হযরত হোসাইনের (রা) কাছে এই মর্মে একখানা পত্র লিখলেন যে, আমরাও ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী নই। আপনি এই মুহূর্তে কুফায় চলে আসুন। আমরা সবাই আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব। কুফায় ইয়াযীদ কর্তৃক মনোনীত গভর্নর হযরত নোমান ইবনে বাশীরকে (রা) আমরা এখান থেকে বহিস্কার করে দিব। এ পত্র লিখার দু' দিন পরে, তাঁরা পুনরায় আর একখানা পত্র হযরত হোসাইনের (রা) কাছে লিখলেন। যে পত্রে ইয়াযীদ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের কথা উল্লেখ ছিল এবং তার মোকাবিলায় হযরত হোসাইনকে (রা) সাহায্য-সহযোগিতা করার ও তাঁর হাতে বাইয়াত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়াও তাঁরা হযরত হোসাইনের (রা) কাছে বিশেষ এক প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করেন। হযরত হোসাইন (রা) এই প্রতিনিধি দল দেখে এবং পত্র পেয়ে কুফা যেতে খুবই উদ্বুদ্ধ হলেন। তবে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কাজ এটাই করেছিলেন যে, প্রথমে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন এবং তাঁর কাছে একখানা পত্র লিখে দেন। পত্র খানা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সালামে মাসনুন বাদ, আপনাদের পত্র আমার কাছে যথা সময়ে পৌছেছে। আপনাদের বর্তমান অবস্থা আমি অনুধাবন করতে পেরেছি। আমার বিশ্বস্ত চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে আপনাদের কাছে প্রেরণ করলাম। তিনি ওখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে পত্র লিখবেন। তিনি সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর যদি আমাকে আসার জন্য পত্র লিখেন, তবে আমি সাথে সাথেই চলে আসব।"

মুসলিম বিন আকীল কুফা গমনের পূর্বে মদীনা শরীফে পৌছেন এবং মসজিদে নববীতে নামায আদায় করেন। অতঃপর পরিবার-পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে কুফা রওয়ানা হন। কুফায় পৌছে প্রথমে তিনি মুখতারের গৃহে অবস্থান করেন। সেই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সেখানে আসতে লাগলেন। যখনই কোন নতুন লোক আসতেন, তখনই মুসলিম বিন আকীল তাকে হযরত হোসাইনের (রা) পত্রখানা পাঠ করে শুনাতেন। যা শুনে, সবার চোখে পানি এসে যেত। মুসলিম বিন আকীল কিছু দিন কুফায় অবস্থান করে বুঝতে পারলেন যে, এখানের সাধারণ মুসলমানগণ ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত হতে মোটেই আগ্রহী নন। বরং তারা হযরত হোসাইনের (রা) হাতে বাইয়াত হতে অত্যন্ত আগ্রহী। মুসলিম ইবনে আকীল এ অবস্থা অবলোকন করে, হযরত হোসাইনের (রা) খেলাফতের ওপর বাইয়াত নেয়া শুরু করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শুধু কুফা থেকে আঠার হাজার মুসলমান হযরত হোসাইনের (রা) খেলাফতের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

হযরত হোসাইনকে (রা) কুফায় আগমনের জন্য মুসলিম বিন আকীলের আহ্বান

কুফায় অবস্থান করে মুসলিম বিন আকীল এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন যে, হযরত হোসাইন (রা) যদি কুফায় আগমন করেন তবে অবশ্যই গোটা ইরাকবাসী তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। আর হিজাজের লোকেরা তো প্রথম থেকেই তাঁর অনুসারী ও শুভাকাঙ্খী। এ অবস্থায় আশা করা যায়, ইসলামী খেলাফত থেকে ইয়াযীদ কর্তৃক আসন্ন বিপদ দূরীভূত হবে এবং একটি সঠিক ও ন্যায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম বিন আকীল যখন দেখলেন যে, কুফার পরিবেশ হযরত হোসাইনের (রা) অনুকূলে, তখন তিনি হযরত হোসাইনকে (রা) কুফায় আসার জন্য পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানালেন। (ইবনে আসীর)

অবস্থার পরিবর্তন

আল্লাহর কি ইচ্ছা! হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পত্র প্রেরণের পরেই এদিকের অবস্থা ক্রমশই পরিবর্তন হতে লাগল। ইয়াযীদ কর্তৃক মনোনীত কুফার আমীর (গভর্নর) নোমান বিন বাশীর যখন জানতে পারল যে, মুসলিম বিন আকীল হযরত হোসাইনের (রা) পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করছেন, তখন সে লোকদের সমবেত করে এক ভাষণ প্রদান করেন। যে ভাষণটি নিম্নরূপ ঃ -

"আমরা কারও সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে চাই না। আর সন্দেহ অথবা মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করতেও চাই না। কিন্তু যদি তোমরা বিদ্রোহ কর এবং আমাদের ইমাম ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত হওয়াকে অস্বীকার কর, তবে সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে, ততক্ষণ সেই তলোয়ার দ্বারা তোমাদেরকে সোজা করে দিব।" (কামিল ইবনে আসীর ৯ঃ৪)

আবদুল্লাহ বিন মুসলিম, যার সাথে বনু উমাইয়ার সুসম্পর্ক ছিল। সে এই ভাষণ শুনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, হে কুফার আমীর! আপনার সামনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই আপনার কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আপনার এই সিদ্ধান্ত দুর্বলতা ও ভীরুতার সিদ্ধান্ত। নোমান বিন বাশীর জবাবে বললেন,

"আমি আল্লাহ তা'য়ালার অনুগত্যে নিজকে অতি দুর্বল ও ভীত মনে করছি। আল্লাহর নাফরমানীর কাজে আমাকে সাহসী ও বীর পুরুষ বলার চেয়ে এটাই (দুর্বলতা ও ভীরুতা) আমার কাছে অতি উত্তম।" (ইবনে আসীর)

এই পরিস্থিতি অবলোকন করে, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম নিজেই ইয়াযীদের কাছে একখানা পত্র লিখলো। মুসলিম বিন আকীলের কুফায় আগমন এবং হযরত হোসাইনের (রা) পক্ষে বাইয়াত গ্রহণের বিষয় পত্রে উল্লেখ করে সে লিখলো, "যদি কুফা নগরী আপনার প্রয়োজন হয় এবং এটিকে আপনি আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তবে অতিশীঘ্র এখানের জন্য এমন এক শক্তিশালী আমীর প্রেরণ করুন, যে আপনার নির্দেশাবলি কঠোর হস্তে এখানে কার্যকর করতে সক্ষম হবে। বর্তমান আমীর নোমান বিন বাশীর অত্যন্ত দুর্বল ও ভীত। অথবা ইচ্ছা করে দুর্বলতা প্রকাশ করছেন।"

এ পত্রের সাথে আরও কতিপয় লোক ইয়াযীদের কাছে অনুরূপ একই পত্র লিখলো। যাদের মধ্যে ছিল আম্মারাহ ইবনে ওয়ালীদ এবং আমর বিন সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস প্রমুখ। ইয়াযীদের কাছে যখন এই পত্র পৌছল তখন সে তার পিতা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বিশেষ পরামর্শ দাতা সারজুনকে ডেকে এনে কুফার প্রশাসনিক দায়িত্ব কার কাছে অর্পণ করা যায়, এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলো। তিনি কুফার আমীর হিসেবে আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের নাম প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ইয়াযীদের সাথে আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। এ কারণে

সারজুন ইয়াযীদকে বললেন, আমি আপনার কাছে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ যদি আপনার পিতা হযরত মুয়াবিয়া (রা) জীবিত থাকতেন এবং তিনি আপনাকে যদি কোন পরামর্শ দিতেন তা কি আপনি মেনে নিতেন ? ইয়াযীদ বললো, অবশ্যই নিতাম। তখন সারজুন, হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) একখানা নির্দেশনামা বের করে দেখালেন। যে নির্দেশ নামায় কুফার আমীর আবদুল্লাহ বিন যিয়াদকে মনোয়ন করা হয়েছিল।

কুফায় ইবনে যিয়াদকে নিয়োগ ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যার নির্দেশ

ইয়াযীদ, সারজুনের পরামর্শ মেনে নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কুফা ও বসরার আমীর (গভর্নর) নিযুক্ত করলো এবং তার কাছে এই মর্মে পত্র লিখল যে, অতিদ্রুত কুফার পৌঁছে মুসলির বিন আকীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করো। অথবা তাঁকে কুফা হতে বহিষ্কার করে দাও। ইবনে যিয়াদ এই পত্র পেয়েই কুফায় আগমনের সিদ্ধান্ত নিলো।

বসরাবাসীর কাছে হযরত হোসাইন (রা)-এর পত্র

এদিকে হযরত হোসাইন (রা) বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে একখানা পত্র লিখলেন। যে পত্রের বিষয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আপনারা দেখছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মিটে যাচ্ছে এবং বিদয়াত ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে রক্ষা করুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।"

(ইবনে আসীর- ৯ঃ৪)

এই পত্রটি গোপনে প্রেরণ করা হয়েছিল। সবাই পত্রটি গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানযার বিন জারদাদ চিন্তা করলেন যে, এই পত্রটি হয়তো ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর নিয়ে এসেছে। এ ধারণা করে মান্যার পত্রখানা ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছে দিল এবং বাহককেও তার সামনে হাযির করলো। ইবনে যিয়াদ পত্র বাহককে হত্যা করলো এবং বসরাবাসীকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে এক বক্তব্য রাখলো। সে বললো, "যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করবে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যে আমার কথা শোনবে, তার জন্য রয়েছে

শান্তি। আমাকে আমীরুল মুমেনীন কুফা যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আগামীকাল সকাল বেলা সেখানে যাচ্ছি। আমার ভাই ওসমান বিন যিয়াদকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে বসরায় রেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, তার বিরোধিতার চিন্তা কখনও করবে না। যদি কারো সম্পর্কে আমার কাছে কোন অভিযোগ আসে, তবে আমি তাকে হত্যা করব। হত্যা করব তার অভিভাবক ও গোত্রের সর্দারকেও। তোমরা আমাকে ভাল ভাবেই জান যে, আমি ইবনে যিয়াদ। (কামিল ইবনে আসীর)

কুফায় ইবনে যিয়াদের ভাষণ

অতঃপর ইবনে যিয়াদ, মুসলিম বিন ওমর বাহেলী ও শুরায়ক ইবনে আওরকে সাথে নিয়ে কুফার দিকে রওয়ানা হলো। কুফার লোকেরা প্রথম থেকেই হযরত হোসাইনের (রা) আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেখানের অনেক লোকেরাই হযরত হোসাইনকে (রা) চিনতেন না। ইবনে যিয়াদ যখন কুফায় পৌঁছলো, তখন তাকে দেখে লোকেরা মনে করলো যে, ইনিই হযরত হোসাইন (রা)। এ ধারণায় কুফাবাসী ইবনে যিয়াদকে দেখে এই বলে অভিবাদন জানাতে লাগলো যে, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ! আপনাকে মুবারকবাদ।" ইবনে যিয়াদ এই দৃশ্য নীরবে অবলোকন করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। সে বুঝতে পারল যে, কুফায় হযরত হোসাইনের (রা) একচ্ছত্র শাসন কায়েম হয়ে গেছে। অর্থাৎ কুফার সব লোকেরাই হযরত হোসাইনের সমর্থক। গোটা কুফা শহরে হযরত হোসাইনের (রা) আগমন বার্তা প্রচার হয়ে গেল। লোকেরা দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে লাগলো। এদিকে কুফার গভর্নর নোমান বিন বাশীরের কাছেও এই আগমনের খবর পৌঁছে গেল। নোমান বিন বাশীর ইয়াযীদ কর্তৃক মনোনীত হলেও "আহলে বাইতের"[১] প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁর গৃহের দরজা বন্ধ করে দিয়ে নীরবে বসে রইলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলো। লোকেরা তাঁকে হযরত হোসাইন (রা) মনে করে তার কাছে ভীড় জমালো। দরজার সামনে লোকের চীৎকার ও গোলমাল শুনে নোমান ইবনে বাশীর মনে করলেন যে, হয়তো হযরত হোসাইন (রা) লোকজনসহ তার কাছে

টিকাঃ

১। আহলে বাইত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মানিত পরিবার-পরিজনগণ।

এসেছেন। এ ধারণায় তিনি গৃহের মধ্যে বসেই উচ্চ আওয়াজে বললেন, "যেই আমানত (অর্থাৎ কুফার শাসনভার) আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তা আমি কোনভাবেই আপনাকে অর্পণ করব না। এ ছাড়া আপনার সাথে মোকাবিলা করতেও আমি আগ্রহী নই।" ইবনে যিয়াদ এই দৃশ্য এবং কুফার গর্ভনরের অবস্থা নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিল। অতঃপর ইবনে যিয়াদ নোমানের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে ডাক দিয়ে বললো, দরজা খোল আমি ইবনে যিয়াদ। আমি ইয়াযীদের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে এসেছি। তখন দরজা খুলে দেয়া হলো এবং ইবনে যিয়াদ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলো। অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

কুফায় ইবনে যিয়াদের প্রথম ভাষণ

পরদিন সকাল বেলা ইবনে যিয়াদ কুফাবাসীকে সমবেত করে বললো, "আমীরুল মুমেনীন আমাকে তোমাদের এই শহরের হাকীম (গভর্নর) নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত তাদের প্রতি সুবিচার করতে। আর ন্যায্য অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে দিতে।

যে আমার নির্দেশ মেনে চলবে, তার সাথে আমি সুন্দর আচরণ করব। আর যে বিদ্রোহ করবে এবং আমার অবাধ্য হবে, তার প্রতি আমি কঠোর হব। তোমরা ভালভাবে জেনে রেখ, আমি আমীরুল মুমেনীনের একান্ত অনুগত হয়ে তার নির্দেশকে বাস্তবায়ন করবই। আমি ভাল লোকের জন্য মেহেরবান পিতার তুল্য এবং আমার অনুগতদের জন্য আপন ভাইয়ের মত। আমার তলোয়ার এবং চাবুক শুধু তাদের জন্যই, যারা আমার অবাধ্য হবে এবং আমার বিরোধিতা করবে। সুতরাং তোমরা স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য বিদ্রোহ থেকে বিরত থাক।"

অতঃপর শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বললো যে—

"তোমাদের শহরে বাইর থেকে যেসব লোক এসে অবস্থান করছে এবং যারা ইয়াযীদের বিরোধিতা করছে, তাদের সবার তালিকা তৈরি করে দ্রুত আমার কাছে পেশ কর। যে ব্যক্তি এসব লোকদের তালিকা তৈরি করে আমার কাছে পেশ করবে, সে দায় মুক্ত। আর যে এ তালিকা তৈরি করতে অসমর্থ হবে, তার এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে তার এলাকায় বা মহল্লায় ইয়াযীদের কেউ বিরোধিতা করবে না। আর যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হবে না, তার সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা তাকে হত্যা করব। যার গৃহে

খলীফা ইয়াযীদের বিরোধী কোন লোক পাওয়া যাবে, তাকে তার গৃহের দরজার সামনেই শুলে লটকান হবে এবং তার সব কিছু হরণ করে নেয়া হবে।

মুসলিম বিন আকীলের স্থান পরিবর্তন

মুসলিম বিন আকীল, মুখতার ইবনে আবু ওবায়দার গৃহে অবস্থান করতে ছিলেন এবং সেখানে বসেই হযরত হোসাইনের (রা) খেলাফতীর ওপর বাইয়াত নিচ্ছিলেন। ইবনে যিয়াদের উপরোল্লিখিত ভাষণের কথা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন তিনি আশংকা করলেন যে, তাঁর এখানে অবস্থানের সংবাদ ইবনে যিয়াদকে হয়তো কেউ জানিয়ে দিবে। এ কারণে তিনি মুখতারের গৃহ ত্যাগ করে হানী ইবনে ওরওয়ার গৃহে চলে আসলেন। তার গৃহের দরজার সামনে পৌঁছে তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি (হানী) বাইরে এসে মুসলিম ইবনে আকীলকে দেখে পেরেশান হয়ে পড়েন। মুসলিম তাঁকে বললেন, আমি তোমার কাছে আশ্রয় নেয়ার জন্য এসেছি। হানী ইবনে ওরওয়াহ বললেন, আপনি আমাকে কঠিন মসিবতের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। আপনি যদি আমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করতেন, তবে বাইর থেকেই আপনার চলে যাওয়াটা আমি পছন্দ করতাম। আপনি যখন আমার গৃহ পর্যন্ত এসেই গেছেন, তখন আপনাকে আশ্রয় দেয়া আমার মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করছি। আচ্ছা, আসুন। হানী ইবনে ওরওয়ার অনুমতি পেয়ে মুসলিম তাঁর গৃহে আশ্রয় নিলেন। কুফার লোকজন (যারা হযরত হোসাইনের রা অনুসারী) গোপনে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

মুসলিম (রা) কে গ্রেফতারের জন্য ইবনে যিয়াদের কৌশল

এদিকে ইবনে যিয়াদ তাঁর এক বিশেষ বন্ধুকে ডেকে তাকে তিন হাজার দিরহাম প্রদান করে বলল যে, "তুমি মুসলিম বিন আকীলকে খুঁজে বের করে দাও।" সে বন্ধু লোকটি মুসলিম বিন উজ্জা আসাদী নামক এক ব্যক্তির সাথে মসজিদে গিয়ে সাক্ষাৎ করলো। সে পূর্বেই অবহিত হয়েছিল যে, এই লোকটি মুসলিম বিন আকীলের (রা) অত্যন্ত বিশ্বস্ত। মসজিদে তাকে নামাযরত অবস্থায় পেল। নামায শেষে তাঁকে এক আলাদা স্থানে ডেকে নিয়ে সেই বন্ধু লোকটি বলল, আমি সিরিয়ার অধিবাসী। আল্লাহ তা'য়ালা আমার প্রতি মেহেরবানী করে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত আওলাদগণের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি এই তিন হাজার

দিরহাম তাকে দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি যিনি হযরত হোসাইনের (রা) পক্ষে বাইয়াত নিচ্ছেন। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, বর্তমানে যিনি বাইয়াত নিচ্ছেন, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন। তাই আপনি এই দিরহামগুলো গ্রহণ করুন। আর আমাকে সেখানে মেহেরবানী করে নিয়ে চলুন। আমি তাঁর হাতে বাইয়াত হতে অত্যন্ত আগ্রহী। আর যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আপনিই তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে বাইয়াত করান।

মুসলিম বিন উজ্জা বললেন, আপনার সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হবে, ইনশা আল্লাহ। আশা করি আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার দ্বারা এই সম্মানিত 'আহলে বাইতের' কিছু সাহায্য হবে। তবে আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমার নামটি সর্বত্র প্রচার হয়ে যাবে। অবশেষে মুসলিম বিন উজ্জা তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কখনই তার নাম প্রকাশ করবে না। লোকটি এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে কিছু দিন আসা-যাওয়া করতে লাগলো। অতঃপর মুসলিম বিন উজ্জা লোকটিকে মুসলিম বিন আকীলের সাথে সাক্ষাৎ করায়ে দিলেন।

হানী বিন ওরওয়ার গৃহে ইবনে যিয়াদ

ঘটনাক্রমে হানী বিন ওরওয়াহ একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবনে যিয়াদ তাকে দেখার জন্য তার গৃহে গমন করেন। এ সময় হানীকে আমারাহ বিন আবদে সালওয়া বলল, ইবনে যিয়াদকে হত্যা করার এটিই একটি অপূর্ব সুযোগ। সেতো এখন তোমার হাতের মধ্যেই। হানী বিন ওরওয়াহ বললেন, তাকে নিজ গৃহে বসে হত্যা করাটা হবে শালীনতা বিরোধী কাজ। সুতরাং এ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটলো, শুরায়ক ইবনে আ'ওর, যিনি ইবনে যিয়াদের সাথে কুফায় আগমন করেছিলেন। তিনি (শুরায়ক) 'আহ্লে বাইয়াতকে' আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। এ কারণে তিনি ইবনে যিয়াদ থেকে আলাদা হয়ে হানী বিন ওরওয়ার ঘরে মেহমান হিসেবে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি হানী বিন ওরওয়ার গৃহে বসেই একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবনে যিয়াদ তার অসুস্থতার খবর পেয়ে সেখানে সংবাদ পাঠালেন যে, "আজ সন্ধ্যায় আমি শুরায়ককে দেখতে যাব।"

মুসলিম বিন আকীল (রা)-এর সদাচরণ ও সুন্নাতের অনুসরণ

শুরায়ক ইবনে আ'ওর ইবনে যিয়াদের এই আগমনকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলিম বিন আকীলকে (রা) বললেন, "পাপীষ্ট ইবনে যিয়াদ আজ সন্ধ্যায় আমাকে দেখার জন্য এখানে আসছে। যখন সে এসে আমার কাছে বসে যাবে, তখন আপনি তার ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আপনি প্রশান্ত মনে নেতৃত্বের আসনে বসবেন। আর আমি সুস্থ হলে, বসরা গিয়ে সেখানে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে এনে দিব। সন্ধ্যা হলো। ইবনে যিয়াদের আগমনের সময় অতি সন্নিকটে। মুসলিম বিন আকীল (রা) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন। শুরায়ক তাঁকে বারবার বলেছিলেন, খবরদার এবার যেন এই সুযোগ হাত ছাড়া না হয়। ইবনে যিয়াদ এসে বসামাত্রই তাকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু এ সময়ও অতিথি সেবক হানী বিন ওরওয়াহ বললেন, "ইবনে যিয়াদ আমার গৃহে বসে হত্যা হোক, এটা আমি পছন্দ করি না।" ইতোমধ্যে ইবনে যিয়াদ এসে গেল। সে শুরায়কের কাছে তার রোগের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শুরায়ক ইচ্ছা করেই আলোচনা দীর্ঘ করলো। যখন তিনি (শুরায়ক) দেখলেন যে, মুসলিম বিন আকীল সামনে আসছে না, তখন তিনি নিচের কবিতা আবৃত্তি করলেন, ما تنظرون بسلمى لاتحيون

"তুমি সালমা সম্পর্কে কি প্রতীক্ষা করছ, তাকে কেন সালাম দিচ্ছ না?"

শুরায়ক বারবার এ কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। ইবনে যিয়াদ ভাবলেন, হয়তো রোগের কারণে সে এরূপ বলছে। ইবনে যিয়াদ হানী বিন ওরওয়ার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে হানী বললেন যে, রোগের কারণে তার এরূপ অবস্থা। কখনও কখনও তিনি অহেতুক কথাবার্তা বলেন। ইবনে যিয়াদের সাথে তার দেহরক্ষীও এসেছিল। সে বিষয়টি বুঝতে পেরে ইবনে যিয়াদকে তাড়াতাড়ি ওঠার জন্য ইঙ্গিত দিল। ইবনে যিয়াদ দ্রুত চলে গেল।

ইবনে যিয়াদের চলে যাবার পর মুসলিম বিন আকীল বের হলেন। শুরায়ক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ সুযোগটি কেন ছেড়ে দিলেন? তাকে হত্যা করতে আপনার অসুবিধা ছিল কি? মুসলিম বিন আকীল (রা) জবাবে বললেন, দুটি বৈশিষ্ট্য আমাকে এ হত্যার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। এক, যার গৃহে আমরা মেহমান হয়ে এসেছি, সেই অতিথি সেবক হানী বিন ওরওয়ার কাছে এই কাজটি খুবই অপছন্দনীয় ছিল। দ্বিতীয়ত, হযরত আলী (রা) আমাকে একটি হাদীস

শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুমিন বাহানা করে অকস্মাৎ হত্যা করা কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয়।"

হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর মধ্যে পার্থক্য

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলিম বিন আকীল (রা) তিনি তাঁর সামনে সুস্পষ্টভাবে মৃত্যু দেখছেন। শুধু তাঁরই মৃত্যু নয়, বরং গোটা আহলে বাইতের মৃত্যুই তাঁর সামনে ভাসছে। অন্যদিকে ইসলামী শরীয়তের বিধানগুলো তাঁরই সামনে মিটে যেতে দেখছেন। আর এগুলো যার দ্বারা সংঘটিত হতে যাচ্ছে, সেই ব্যক্তি (ইবনে যিয়াদ) তাঁর তাঁবুতে এমনভাবে এসে গিয়েছিল যে, তাকে অতি সহজভাবেই হত্যা করা যেত। কিন্তু এখানে একজন হকপন্থীর বিশেষ করে আহ্‌লে বাইতের শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুন্নাতের অনুগত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এটা ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দুশমনকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তাঁর হাতে তলোয়ার ওঠেনি। তিনি তাঁর হাতকে হত্যা থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। এটাই একজন হকপন্থীর বৈশিষ্ট্য। একজন হকপন্থী তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে খুব চিন্তা করেন যে, আমার এই পদক্ষেপটি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষে না বিপক্ষে। যদি পক্ষে হয়, তবে সেটি প্রাণের বিনিময়ে হলেও করে যান। আর যদি বিপক্ষে হয় তবে তা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। কোন ভয়-ভীতি বা পার্থিব লোভ সে পথে তাকে কখনই নিতে পারে না।

অতঃপর শুরায়ক তিন দিন পর সে অসুস্থতেই ইন্তেকাল করেন। ইবনে যিয়াদ যে লোকটিকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে খোঁজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল, সে লোকটি মুসলিম বিন উজ্জার কাছে বারবার আসতে লাগলো।

একদিন মুসলিম বিন উজ্জা তাকে নিয়ে মুসলিম বিন আকীলের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। সে লোকটি সেখানে পৌঁছে মুসলিম বিন আকীলের (রা) হাতে হযরত হোসাইনের খেলাফতীর ওপর বাইয়াত হলো এবং ইবনে যিয়াদের প্রদত্ত তিন হাজার দিরহাম তাঁকে প্রদান করলো। এর পর থেকে সে লোকটি দৈনিক মুসলিম বিন আকীলের (রা) কাছে আসা-যাওয়া করত এবং তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম ও অবস্থা ইবনে যিয়াদকে অবহিত করত।

হানী বিন ওরওয়াকে গ্রেফতার

ইবনে যিয়াদের কাছে যখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হানী বিন ওরওয়া মুসলিমের (রা) আশ্রয়দাতা, তখন সে মুসলিম (রা) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল। লোকদের কাছে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার! কতদিন পর্যন্ত হানী বিন ওরওয়া আমার কাছে আসছে না! লোকেরা তাঁর অসুস্থতার কথা বললো। কিন্তু ইবনে যিয়াদকে তো তার গুপ্তচর সব কথা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে। ইবনে যিয়াদ বললো, তোমাদের এ কথা ঠিক নয়। সেতো অনেক দিন আগেই সুস্থ হয়েছে। সে তার ঘরের দরজায় প্রহরী হিসেবে বসে থাকে। তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাও। সে যেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আমার কাছে এসে যেন সাক্ষাৎ করে। লোকেরা হানীর কাছে এসে এই পরিস্থিতির কথা তাঁকে জানিয়ে বললো যে, আপনি এখন আমাদের সাথে চলুন। হানী নিজকে অসহায় মনে করে তাদের সাথে যাবার জন্য সাওয়ারীতে আরোহন করলেন। যখন তিনি ইবনে যিয়াদের প্রাসাদের নিকটে পৌঁছলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আজ তাঁর জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। সেই প্রেরিত লোকদের মধ্যে হাস্‌সান বিন আস্‌সা নামক তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি ছিল। তাকে তিনি (হানী) বললেন, ভাই! আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে। হাস্‌সান জবাব দিলো যে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তো আপনার ব্যাপারে কোন ভয়ের কিছু দেখছি না। মূলতঃ হাস্‌সান এঘটনা সম্পর্ক অনবহিত ছিল। একারণে সে এ কথা বলেছিল। ইবনে যিয়াদের প্রেরিত লোকেরা হানীকে নিয়ে ইবনে যিয়াদের প্রাসাদে প্রবেশ করলো। ইবনে যিয়াদ, কুফার কাজী ওরায়হকে বললো, একজন বিশ্বাসঘাতক নিজের পায়ে হেটে এখানে চলে আসছে। হানী যখন ইবনে যিয়াদের সামনে আসলো, তখন ইবনে যিয়াদ নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করলোঃ

ارید حیاته ویرید قیلی

"দীর্ঘ জীবন তাঁহার, আমি করি কামনা
আর সেই ব্যক্তিই আমার হত্যার করে কামনা।"

হানী বললেন, এ কেমন কথা? ইবনে যিয়াদ বললো, আপনি কি মনে করেন যে, আমি সেই ষড়যন্ত্র থেকে অনবহিত, যা আমীরুল মুমিনের বিরুদ্ধে আপনার গৃহে বসে হচ্ছে ? আপনি মুসলিম বিন আকীলকে (রা) আপনার গৃহে আশ্রয়

দিয়েছেন। আপনি তাঁর মাধ্যমে অশ্ব ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতেছেন। হানী এগুলো অস্বীকার করলেন। পারস্পরিক বাদানুবাদে সময় দীর্ঘ হয়ে গেল। অতঃপর ইবনে যিয়াদ তার সেই গুপ্তচরটিকে সামনে উপস্থিত করলো। এই লোকটির মাধ্যমেই ইবনে যিয়াদ সব খবর পেয়েছিল। এ দৃশ্য দেখে হানী প্রথমে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। অতঃপর নিজকে সামলিয়ে অকপটে বললেন, হে ইবনে যিয়াদ! আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলব না। ঘটনা হচ্ছে এই যে, খোদার কসম! আমি মুসলিম বিন আকীলকে আমার গৃহে ডেকে আনিনি এবং তার ব্যাপারে আমি একেবারেই অনবহিত ছিলাম। অকস্মাৎ তাঁকে আমি আমার দরজার সামনে বসা দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, আমি আপনার গৃহে আজ মেহমান হব। তাঁকে আমার গৃহ থেকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা হলো। এ কারণে আমার ওপর অনেকই দায়িত্ব এসে পড়লো। আমি অপার হয়ে তাঁকে আমার গৃহে মেহমান হিসেবে থাকার জন্য অনুমতি দিয়েছি। আপনি যদি আমাকে অভয় প্রদান করেন, তবে আমি এখনি আমার গৃহে পৌছে, তাঁকে আমার গৃহ থেকে বের করে দিব। অতঃপর পুনরায় আপনার কাছে চলে আসব। ইবনে যিয়াদ বললো, আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার থেকে যেতে পারবে না যতক্ষণ মুসলিম বিন আকীলকে (রা) আমার কাছে সমার্পন না করবেন। হানী বললেন, এটা কখনই হতে পারে না যে, আমি আমার মেহমানকে আপনার কাছে সমর্পন করব আর আপনি তাঁকে হত্যা করবেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলিম বিন ওমর বাহেলী ইবনে যিয়াদের কাছে বললো, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একটু আলোচনা করি। মুসলিম বিন ওমর হানীকে ভিন্ন একটি জায়গায় নিয়ে বললো, কেন আপনি আপনার নিজ জীবনকে শেষ করতে যাচ্ছেন ? মুসলিমকে (রা) ইবনে যিয়াদের হাতে সমার্পন করে দেন। তারা পরস্পরে ভাই ভাই। তারা পরস্পরে মিলে যাবে। তাঁকে হত্যা করবে না এবং তাঁর কোন অনিষ্টও করবে না। এতে আপনার কোন অসম্মানিও হবে না এবং কোন অসুবিধাও হবে না। হানী বললেন, এর চেয়ে লাঞ্ছনা ও অসম্মানী আর কি হতে পারে যে, আমি আমার মেহমানকে, তাঁর দুশমনের হাতে সমর্পণ করে দিব।

খোদার কসম! আমার যদি কোন সাহায্যকারীও না থাকে, আমি যদি একাও হই, তবুও আমার মেহমানকে আমার জীবন থাকতে তার হাতে সমর্পণ করব না।

হানী ইবনে ওরওয়ার ওপর ভীষণ নির্যাতন

হানী ইবনে ওরওয়ার এই দৃঢ়তা দেখে, ইবনে যিয়াদ এবং তার দেহরক্ষী উভয় মিলে হানী ইবনে ওরওয়ার মাথার চুল ধরে তাঁকে বেদম প্রহার শুরু করলো। প্রহারে তাঁর নাক ও মুখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। ইবনে যিয়াদ প্রমত্ত অবস্থায় হানীকে বললো, মুসলিম বিন আকীলকে (রা) আমাদের কাছে সমর্পণ কর। অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। হানী নির্বিঘ্নে বললেন, আমাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য এত সহজ নয়। যদি আমাকে হত্যা কর, তবে তোমাদের রাজ প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। হানীর এ কথায় ইবনে যিয়াদ আরও উত্তেজিত হলো এবং ভীষণভাবে তাঁকে মার পিট শুরু করলো।

আসমা বিন খারিজা, যিনি হানীকে তাঁর বাড়ী থেকে ডেকে এনেছিলেন এবং তাঁকে এই বলে নিশ্চিন্ত করে ছিলেন যে, "আপনি কোনই চিন্তা করবেন না," তিনি এসময় হানীর কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইবনে যিয়াদকে বললেন, হে বিশ্বাসঘাতক! তুমি আমার দ্বারা এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে তার ওপর এভাবে অত্যাচার করতেছ! তার এ কথায় ইবনে যিয়াদ নিবৃত্ত হলো।

হানীর সমর্থনে ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এদিকে শহরে প্রচার হয়ে গেল যে, হানীকে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর যখন আমর বিন হুজ্জাজের কাছে পৌছল, সাথে সাথে সে **"মুযাজ্জাজ"** গোত্রের বহু যুবকরদের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছলো এবং ইবনে যিয়াদের বাড়ি অবরোধ করলো। এতে ইবনে যিয়াদ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে (ইবনে যিয়াদ) কাজী শুরায়হকে বললো, আপনি বাড়ির বাইরে গিয়ে অবরোধকারী যুবকদেরকে বলুন যে, হানী ইবনে ওরওয়া নিরাপদে আছেন। তাঁকে হত্যা করা হয় নি। আমি নিজে তাকে দেখে এসেছি। ওরায়হের সাথে ইবনে যিয়াদ তার বিশ্বস্ত একজন গুপ্তচর দিয়ে দিলো, সে (কাজী), ইবনে যিয়াদের কথাগুলো অবরোধকারীদের কাছে ঠিকমত বলে কিনা, তা অবগত হওয়ার জন্য। কাজী ওরায়হ ইবনে যিয়াদের কথাগুলো অবরোধকারীদের কাছে বলার পর আমর বিন হুজ্জাজ তার সাথীদেরকে বললো, এখন আমরা শান্ত। তোমরা ফিরে যাও। হানী বিন ওরওয়ার শাহাদা, ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তার বাসভবন অবরোধের খবর যখন মুসলিম বিন আকীল শুনলেন, তখন তিনিও ইবনে

যিয়াদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যেই আঠার হাজার মুসলমান তাঁর হাতে হযরত হোসাইনের (রা) পক্ষে বাইয়াত হয়েছিলেন, তারা এ মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সমবেত হতে শুরু করলেন। চার হাজার মুসলমান এসে সমবেত হলো। বাকীরাও আসতে ছিলেন। এই মুসলিম সৈন্যবাহিনী ইবনে যিয়াদের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো। ইবনে যিয়াদ এই খবর পেয়ে প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিলো। মুসলিম (রা) ও তাঁর সাথীরা ইবনে যিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন।

মুসলিম বিন আকীলের (রা) লোকজন সন্ধ্যা পর্যন্ত আসতেই রইলো। তাঁর লোকজনে শহরের মসজিদ ও বাজারগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইবনে যিয়াদের সাথে তার প্রসাদে শুধু ত্রিশজন সৈন্য এবং তার গোত্রের কিছু সর্দার ছিল। ইবনে যিয়াদ তার লোকজনের মধ্য হতে এমন কতিপয় লোক নির্ধারণ করলো, যাদের সাথে মুসলিম বিন আকীলের (রা) সাথে আগত লোকদের সম্পর্ক রয়েছে অথবা তাঁদের ওপর কিছুটা প্রভাব রয়েছে। ইবনে যিয়াদ এই মনোনীত লোকদেরকে বললো!, তোমরা বাইরে বেরিয়ে নিজ নিজ পরিচিত ব্যক্তিকে এবং যাদের ওপর তোমাদের প্রভাব রয়েছে তাদেরকে মুসলিম বিন আকীলের (রা) সহযোগিতা করা থেকে বিরত রেখ। তাদেরকে রাজত্বের প্রলোভন দেখিয়ে হোক, অর্থ-সম্পদের লোভ প্রদর্শন করে হোক, যে কোন ভাবেই হোক তাদেরকে মুসলিম বিন আকীলের (রা) থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এস। এদিকে শীয়া নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিলো যে, তোমরা প্রাসাদের ছাদে ওঠে লোকদেরকে এই বিদ্রোহ থেকে বিরত রেখ। আর এই ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে অবরোধ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বল।

অবরোধকারীদের পলায়ন

অবরোধকারীরা যখন তাদের নেতৃবৃন্দের থেকে এই ঘোষণা শোনতে পেল, তখন তারা অবরোধ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলো। মহিলারা তাদের সন্তানদেরকে, রনাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ইবনে যিয়াদের প্রাসাদের দিকে আসতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ইবনে আকীলের (রা) সাথে মাত্র ত্রিশজন লোক মসজিদে থেকে গেলেন। এ পরিস্থিতি দেখে মুসলিম বিন আকীলও (রা) এই স্থান ত্যাগ করে "আবওয়াবে কান্দাহ" এর দিকে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি দ্বার প্রান্তে গিয়ে পৌছলেন, তখন তাঁর সাথে একটি লোকও ছিল না। মুসলিম বিন

আকীল (রা) হয়রান ও পেরেশান অবস্থায় একা একা কুফা শহরের গলিতে গলিতে ঘোরা ফেরা করতেছিলেন। অবশেষে কান্দার তুয়া নামক এক মহিলার গৃহে গিয়ে পৌছলেন। তার ছেলে হেলাল এ সময় বাড়িতে ছিল না। সে এই আন্দোলন উপলক্ষ্যে ঘরের বাইরে ছিল। এ কারণে তার মাতা গৃহের দরজায় তার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করতেছিলেন। মুসলিম বিন আকীল (রা) তার কাছে পানি চাইলেন। পানি পান করে তিনি সেখানে বসে রইলেন। মহিলাটি বললো, আপনি পানি পান করেছেন। এখন আপনি আপনার গৃহে চলে যান। মুসলিম (রা) চুপ রইলেন। মহিলাটি এভাবে তিনবার তাঁকে যাওয়ার জন্য বললেন। কিন্তু মুসলিম (রা) এরপরেও চুপ থাকলেন। অতঃপর মহিলাটি কঠোর ভাষায় তাঁকে বললেন, আপনাকে আমি আমার গৃহের সামনে বসতে দিব না। আপনি আপনার গৃহে চলে যান। এ সময় মুসলিম (রা) বাধ্য হয়ে বললেন, "এই শহরে আমার কোনই ঘর নেই এবং কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। আপনি কি আমাকে একটু আশ্রয় দিবেন। আমি মুসলিম বিন আকীল (রা)। মহিলাটির অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হলো। তিনি (মহিলা) মুসলিম বিন আকীলকে (রা) তার নিজ গৃহে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দিলেন এবং সন্ধ্যায় তাঁর সামনে খাবার দিলেন। মুসলিম (রা) সে খাবার খেলো না। ইত্যবসরে মহিলাটির পুত্র হেলাল, রাস্তা থেকে বাড়িতে এসে পৌছল। সে দেখলো যে, তার মাতা বার বার একটি কক্ষের মধ্যে আসা-যাওয়া করতেছে। পুত্র হেলাল তার মাতার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু তার মাতা বিষয়টি খুব গোপন রাখলেন। বারবার জিজ্ঞাসা করার পর মহিলা তাঁর পুত্রকে বিষয়টি এই শর্তের ওপর জানালেন যে, সে যেন এটি কারও কাছে প্রকাশ না করে।

এদিকে ইবনে যিয়াদ যখন দেখল যে, তার প্রাসাদের কাছে লোকের কোন হৈ-চৈ বা সমাবেশ নেই, তখন সে তার এক সৈন্যকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করলো। সে ফিরে গিয়ে বললো, ময়দান পরিষ্কার। কোথাও কোন লোকজন নেই। এসময় ইবনে যিয়াদ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মসজিদে এসে উপস্থিত হলো এবং তার একান্ত ব্যক্তিদেরকে নিয় মিম্বরের চারপাশে পরামর্শের জন্য বসলো। সে ঘোষণা করে দিতে বললো, সব লোকরা যেন মসজিদে এসে সমবেত হয়। মসজিদে লোকেরা এসে সমবেত হলো। অতঃপর ইবনে যিয়াদ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললো— "নিবোর্ধ ইবনে আকীল (রা) যা করলো, তা তোমরা স্বচক্ষেই অবলোকন করেছ। আজ আমি এই ঘোষণা করছি যে, আমি

যার গৃহে ইবনে আকীলকে (রা) পাব, তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। আর যে তাঁকে আমার সামনে উপস্থিত করতে পারবে, তাকে আমি পুরস্কৃত করব। অতঃপর সে তার পুলিশ প্রধান হুসাইন ইবনে নোমায়যরকে নির্দেশ দিলো যে, শহরে গলিতে-গলিতে এবং বাসা-বাড়ীর দরজাসমূহে প্রহরী নিযুক্ত করো। যাতে কেউ বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে। অতঃপর সব ঘরগুলো তালাশ করো।"

ইবনে যিয়াদের লোকেরা তালাশে বেরিয়ে পড়লো। মহিলার পুত্র হেলাল যখন বুঝতে পারলো যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিম বিন আকীল (রা) আমার ঘর থেকেই ধৃত হবে, তখন সে নিজেই গিয়ে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আস্ আস্ এবং ইবনে যিয়াদকে তাঁর অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলো। ইবনে যিয়াদ মুহাম্মদ বিন আস্ আসের নেতৃত্বে সত্তর জন সৈন্যের একটি দল তাঁকে গ্রেফতারের জন্য প্রেরণ করলো।

সত্তর জন সেনার মোকাবিলায় মুসলিম আকীল

ইবনে যিয়াদের প্রেরীত সত্তর জন সেনা এসে মুসলিম বিন আকীলের (রা) বাসস্থান ঘেরাও করলো। মুসলিম বিন আকীল (রা) তাদের আওয়াজ শুনে, তলোয়ার নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তারা সামনে অগ্রসর হলো, তখন মুসলিম (রা) একাই তাদের মোকাবিলা করে হটিয়ে দিলেন। তারা পুনরায় মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসলো। এবারের মোকাবিলায় মুসলিম (রা) আহত হলেন। কিন্তু দুশমনরা তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো না। অতঃপর তারা ছাদের ওপর ওঠে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর বর্ষণ শুরু করলো এবং তাঁর গৃহে আগুন ধরিয়ে দিলো। মুসলিম বিন আকীল অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এসব কিছুর মোকাবিলা একাই করতেছিলেন। অতঃপর মুহাম্মদ বিন আশ্ আশ্ মুসলিমকে (রা) বললেন, "আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিব। তোমাকে হত্যা করব না। আমি তোমার সাথে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। এখানে যারা রয়েছে, তারা তোমার চাচাতো ভাই। এরা কখনই তোমাকে হত্যা করবে না এবং তোমাকে মারধরও করবে না।"

মুসলিম বিন আকীলকে (রা) গ্রেফতার

মুসলিম বিন আকীল (রা) একা, সত্তরজন নওজোয়ানের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে খুব আহত হলেন। অবশেষে তিনি পেরেশান হয়ে একটি প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁকে একটি সাওয়ারীতে আরোহন করানো হলো এবং তাঁর থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো। অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম বিন আকীল (রাঃ) বললেন, এটা তোমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ যে, নিরাপত্তা প্রদানের পরে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছ। মুহাম্মদ ইবনে আস্ বললো, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হবে না। মুসলিম (রা) বললেন, এগুলো শুধু তোমাদের মুখের কথা। এ সময় মুসলিম বিন আকীলের (রা) চোখ থেকে পানি ঝরছিল। এ সময় মুহাম্মদ বিন আস্ আসের সাথে আমর বিন ওবায়দও ছিল। সে বললো, হে মুসলিম (রা)! আপনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, এরূপ পদক্ষেপ যদি কোন ব্যক্তি গ্রহণ করে, আর যদি সে ধৃত হয়, তবে তাকে ছেড়ে দেয়ার অধিকার কারও নেই। আমর বিন ওবায়দ মুসলিম (রা)-কে নিরাপত্তা প্রদানের বিরোধী ছিল।

হযরত হোসাইন (রা) কে কুফায় আগমনে বাধা দেয়ার ব্যাপারে মুসলিম বিন আকীল (রা)-এর অসিয়ত

মুসলিম বিন আকীল (রা) বললেন, "আমি আমার নিজের প্রাণের মায়ায় ক্রন্দন করছি না। বরং হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ক্রন্দন করছি। যাঁরা আমার পত্রের ভিত্তিতে অতিশীঘ্রই কুফা এসে এবং তোমাদের হাতে আমার মত গ্রেফতার হয়ে যাবেন।" অতঃপর তিনি মুহাম্মদ বিন আস্ আসের কাছে বললেন, "তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছ। আমার ধারণা তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে না। লোকেরা তোমার কথা শুনবে না। তারা আমাকে হত্যা করবেই। তবে তোমার কাছে আমি আজ একটি আবেদন করছি। আশা করি তুমি এটি রক্ষা করবে। সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত হোসাইনের (রা) কাছে একটি লোক অতিদ্রুত প্রেরণ করবে। সে হযরত হোসাইনকে (রা) আমার বর্তমান অবস্থার কথা জানাবে এবং তাঁকে বলবে, তিনি যেন তাঁর পরিবার-পরিজনসহ প্রত্যাবর্তন করেন। কুফাবাসীদের পত্রে তিনি যেন প্রতারিত না হন।"

মুহাম্মদ বিন্ আস্ আস শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমি এ আবেদন রক্ষা করবই।

হযরত হোসাইন (রা) এর কাছে মুহাম্মদ বিন আস্ আসের লোক প্রেরণ

মুহাম্মদ বিন আস্ আস তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য, এক ব্যক্তিকে চিঠি দিয়ে হযরত হোসাইনের (রা) কাছে প্রেরণ করলো। হযরত হোসাইন (রা) এ সময় 'যিয়ালা' নামক স্থানে এসে পৌছিলেন। মুহাম্মদ বিন আস্ আসের দূত সেখানে পৌছে হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পত্রখানা দিলো। পত্রখানা পড়ে হযরত হোসাইন (রা) বললেন—

كل ما قدر نارل عند الله نحسب انفشا وفساد امتنا

"যা নির্ধারিত তা সংঘটিত হবেই। আমি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই আমার নিজের প্রতিদান চাই এবং উম্মতের বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই।

(কামিল ইবনে কাসীর)

এ পত্র পেয়ে হযরত হোসাইন (রা) মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন না। বরং তিনি দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে মুহাম্মদ বিন আস্ আস মুসলিমকে (রা) নিয়ে ইবনে যিয়াদের প্রসাদে প্রবেশ করলো। মুহাম্মদ বিন আস্ আস ইবনে যিয়াদকে বললো, "মুসলিম বিন আকীলকে (রা) নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।" ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে? আমি তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করেছি, না নিরাপত্তা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছি? মুহাম্মদ বিন আস্ আস ইবনে যিয়াদের সামনে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর ইবনে যিয়াদ, মুসলিমকে (রা) হত্যা করার নির্দেশ দিল।

মুসলিম বিন আকীলের (রা) অসিয়ত

মুসলিম বিন আকীল (রা) আগেই জানতেন যে, মুহাম্মদ বিন আস্ আসের নিরাপত্তা প্রদান কোনই কাজে আসবে না। ইবনে যিয়াদ আমাকে হত্যা করবেই। মুসলিম বিন আকীল (রা) বললেন, আমাকে কিছু অসিয়ত করার সুযোগ দিন। ইবনে যিয়াদ অসিয়ত করার সুযোগ দিলো। তখন তিনি ওমর বিন সাদকে বললেন, "আপনার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি সেই আত্মীয়তার সুবাধে বলছি, আমি আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটু কথা বলব। যা একাকীত্বে বলতে হবে। ওমর বিন সাদ একাকীত্বে তাঁর কথা শুনতে সাহস পেল না। ইবনে যিয়াদ বললো, কোন অসুবিধা নেই। তুমি শুনতে পার। তাকে নির্জনে নিয়ে মুসলিম বিন আকীল (রা) বললেন, কথাটি হচ্ছে এই যে, আমি কুফার অমুক ব্যক্তি থেকে সাত শত দিরহাম কর্জ (ঋণ) এনেছিলাম। যা বর্তমানে আমার যিম্মায়। সেটি আপনি আমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিবেন। আর একটি কথা হলো, হযরত হোসাইনের (রা) কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে দিবেন। আমর বিন সাদ মুসলিমের (রা) এই দুটি অসিয়ত পালন করার জন্য ইবনে যিয়াদের কাছে অনুমতি চাইলো। ইবনে যিয়াদ বললো, বিশ্বস্ত ব্যক্তি সে কখনই আত্মসাৎ করে না। তুমি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিতে পার। আর হোসাইনের (রা) ব্যাপারে কথা হলো, তিনি যদি আমার সাথে মোকাবিলা করতে না আসেন, তবে আমিও নিজের পক্ষ থেকে তাঁর সাথে মোকাবিলা করতে যাব না। আর যদি তিনি আমার সাথে মোকাবিলা করতে আসেন, তবে আমিও তাঁর সাথে মোকাবিলা করব।

মুসলিম বিন আকীল (রা) ও ইবনে যিয়াদের কথোপকথন এবং মুসলিম বিন আকীল (রা)-এর শাহাদত

ইবনে যিয়াদ বললো, হে মুসলিম! তুমি এ কাজটি খুবই অন্যায় করেছ যে, মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল, তারা একজন নেতারই অনুসারী ছিল। তুমি এসে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছ। তুমি লোকদেরকে তাদের আমীরের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছ।

মুসলিম বিন আকীল (রা) বললেন, বিষয়টি এভাবের নয়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, এই কুফা শহরের লোকেরা এই মর্মে পত্র লিখেছিল যে, "তোমার পিতা তাদের ভালো মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। অন্যায় ভাবে হত্যা কান্ড চালিয়েছে। রোম ও পারস্য সম্রাটের ন্যায় সে এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাচ্ছে। তাই আমি ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিধান চালু করার জন্য লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করতে ও বুঝাতে বাধ্য হয়েছি।"

মুসলিম বিন আকীলের (রা) এই কথায় ইবনে যিয়াদ উত্তেজিত হয়ে তাঁকে খুব মন্দ বলতে লাগলো। মুসলিম বিন আকীল (রা) চুপ হয়ে রইলেন। অবশেষে ইবনে যিয়াদ নির্দেশ দিল যে, মুসলিমকে (রা) এই রাজপ্রাসাদের ছাদে নিয়ে যাও। সেখানে বসে তাঁর মস্তক দ্বিখন্ডিত করে, নিচের দিকে নিক্ষে কর।

মুসলিম বিন আকীলকে (রা) ছাদে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তাস্বীহ ও ইস্তেগফার পাঠ করতে করতে ছাদের ওপরে পৌছলেন। ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে শহীদ করে নিচে নিক্ষেপ করা হলো। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজেউন।"

মুসলিম বিন আকীলের (রা) শাহাদতের পরে, হানী বিন ওরাওয়াকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো। তাকে বাজারে উন্মুক্ত স্থানে বসে হত্যা করা হলো। ইবনে যিয়াদ তাঁদের দু'জনার কর্তিত মস্তক ইয়াযিদের কাছে প্রেরণ করলো। ইয়াযিদ, ইবনে যিয়াদের কাছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পত্র লিখলো। পত্রে এ কথাও লিখলো যে, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, হোসাইন (রা) ইরাকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তাঁর খোঁজে শহরে বহুসংখ্যক গুপ্তচর এবং তথ্য অনুসন্ধানকারী নিয়োজিত কর। হোসাইনের (রা) সহযোগী হিসেবে যাকেই সন্দেহ হবে তাকেই গ্রেফতার করবে।

হযরত হোসাইনের (রা) কুফায় গমনে দৃঢ়তা

হযরত হোসাইনের (রা) কাছে কুফাবাসীদের থেকে ইতোপূর্বে প্রায় দেড়শত পত্র এবং অনেক প্রতিনিধি পৌঁছেছিল। এছাড়াও মুসলিম বিন আকীল (রা) এখানে (কুফা শহরে) আঠার হাজার মুসলমানদের বাইয়াত হওয়ার খবর জানিয়ে, তাঁকে কুফায় আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ কারণে হযরত হোসাইন (রা) কুফায় গমনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যখন এই খবর প্রচার হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ব্যতীত অন্য আর কেউই তাঁকে কুফা যেতে পরামর্শ দিলেন না। অনেক সম্মানিত সাহাবাগণ হযরত হোসাইনের (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কুফা যেতে বারণ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ইরাক ও কুফার লোকদের প্রতিশ্রুতি ও বাইয়াতের ওপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন না। সেখানে যাওয়াটা আপনার জন্য খুবই বিপজ্জনক।

ওমর বিন আবদুর রহমানের (রা) পরামর্শ

ওমর বিন আবদুর রহমান (রা) হযরত হোসাইনের (রা) খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি এমন এক শহরের দিকে যাচ্ছেন, যে শহরটি ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেখানের আমীর ও রাজকর্মচারীরা ইয়াযীদেরই অনুগত। তাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে 'বাইতুল মাল'। আর মানুষ সাধারণত অর্থ-কড়ি ও দিরহামের পূজারী। অর্থাৎ এগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আমার আশংকা হচ্ছে, সেই সব লোকেরা আবার আপনার মোকাবিলায় এসে যায় কিনা, যারা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আহ্বান করেছে এবং আপনাকে ভালবাসে, তাদের তুলনায়, যাদের সহযোগী হয়ে তারা আপনার সাথে মোকাবিলা করবে।"

হযরত হোসাইন (রা) কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর উপদেশ শুনলেন এবং বললেন, "আমি আপনার পরামর্শের প্রতি খেয়াল রাখব।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) পরামর্শ

হযরত হোসাইনের (রা) কুফা গমনের খবর যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) শুনলেন, তখন তিনি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি আপনার কুফা গমনের যে খবর শুনছি, এ ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা কি?" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "হ্যাঁ, আমি কুফা গমনের ইচ্ছা করেছি। আজ অথবা আগামীকাল আমি রওয়ানা হব ইনশাআল্লাহ।" ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, "ভাই আমি এর থেকে আপনাকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর নামে আপনি আমাকে বলুন, আপনি কি এমন এক কওমের কাছে যেতে চাচ্ছেন যে কওমের লোকেরা, তাদের সমর্থিত আমীরকে হত্যা করেছে এবং তাদের শত্রুদেরকে শহর থেকে বের করে দিয়েছে। আপনি তাদের আহ্বানেই সেখানে দ্রুত চলে যেতে চান? তারা আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে আহ্বান করছে, যখন তাদের ওপর তাদের আমীর রয়েছে এবং তারা সব সেই আমীর কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাদের এই আহ্বান, আপনাকে এক কঠিন যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান। আমার আশংকা হচ্ছে যে, এই লোকেরা আপনার সাথে প্রতারণা করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে।" হযরত হোসাইন (রা) জবাবে বললেন, আপনার কথা শুনলাম। আমি এ ব্যাপারে 'ইস্তেখারা' করে সিদ্ধান্ত নিব।

ইবনে আব্বাসের (রা) দ্বিতীয় বার আগমন

ইবনে আব্বাস (রা) দ্বিতীয় দিন, হযরত হোসাইনের (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমার ভাই! আমি কোন ভাবেই স্থির থাকতে পারছি না, তাই পুনরায় এসেছি। আমি আপনার এই কুফা গমনকে, আপনার ও আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য এক বিরাট বিপর্যয় বলে আশংকা করছি। ইরাকবাসী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও অবিশ্বস্ত। তাদের কাছে আপনার গমন করা উচিত হবে না। আপনি এই মক্কা শহরেই অবস্থান করুন। আপনি হিজাজবাসীদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। আর ইরাকবাসী যদি আপনাকে সেখানে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করে তবে আপনি তাদেরকে লিখে জানান যে, প্রথমে তোমরা তোমাদের আমীর ও রাজকর্মচারীদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। অতঃপর আমাকে জানাও। আমি সাথে সাথে চলে আসব। আর আপনি যদি মক্কা ত্যাগ করতেই চান, তবে আপনি ইয়ামন চলে যান। সেখানে অনেক দুর্গ ও পাহাড় রয়েছে। এছাড়া শহরটি আয়তনেও অনেক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। সেখানে

আপনার পিতার বহু অনুসারীও রয়েছে। এতে আপনি একটি শান্ত পরিবেশে থেকে নিরিবিলি ভাবে পত্রের মাধ্যমেই ইসলামের বাণী ও আদর্শকে প্রচার করতে পারবেন।"

হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "হে ভাই ইবনে আব্বাস! আমি জানি, আপনি একজন দয়ার্দ্র উপদেশ দাতা। কিন্তু আমি কুফা গমনের দৃঢ় সংকল্প করেছি। এই সংকল্প বাতিল করতে আমি আগ্রহী নই।"

ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, "ভাই! আপনি যদি একান্তই যেতে চান, তবে আমার একটি অনুরোধ, আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন না। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনাকে আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে সেভাবে শহীদ করে দেয় কি না, যেভাবে হযরত ওসমানকে (রা) শহীদ করে দিয়েছে।"

কুফার উদ্দেশ্যে হযরত হোসাইনের (রা) রওয়ানা

হযরত হোসাইন (রা) দ্বীনি প্রয়োজনে কুফা গমনের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। পরামর্শদাতাগণ তাঁকে সেখানের ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং আসন্ন বিপদ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মহান উদ্দেশ্যই তাঁকে এই বিপদের মোকাবিলা করতে বাধ্য করেছে। তিনি হিজরী ষাট সনের তিন অথবা আটই যিলহজ্ব তারিখে মক্কা হতে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন মক্কায় হাকিম (গভর্নর) ছিল, আমর বিন সায়ীদ বিন আস। সে ইয়াযীদ কর্তৃক মনোনীত ছিল। আমার বিন সায়ীদ হযরত হোসাইনের (রা) রওয়ানার সংবাদ পেয়ে, তাঁকে পথে বাধা দেয়ার জন্য কতিপয় লোককে প্রেরণ করল। হযরত হোসাইন (রা) তাদের বাধাকে উপক্ষো করে সামনে অগ্রসর হলেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর সাথে কবি ফরযদকের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

পথে হযরত হোসাইনের (রা) সাথে কবি ফরযদকের সাক্ষাৎ হলো। সে (ফরযদক) ইরাক থেকে আসছিল। হযরত হোসাইনকে (রা) দেখে ফরযদক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন ? হযরত হোসাইন (রা) তার জবাব এড়িয়ে গিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুনতো, ইরাক ও কুফার লোকেরা বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন ? ফরযদক বললেন, ভাল কথা, আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন করেছেন। আপনি শুনুন, "ইরাকবাসীদের অন্তর

আপনার সাথে, কিন্তু তাদের তলোয়ার বনু উমাইয়ার সাথে। ভাগ্য নির্ধারণ হয় আসমান থেকে। আল্লাহর ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়ে থাকে।"

হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি (ফরযদককে) বললেন– "আল্লাহর কুদরতী হাতেই রয়েছে সব কিছু। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। যদি আল্লাহ তা'য়ালার লিখন আমার ইচ্ছার অনুকূলে হয়, তবে আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করব। আর এ শোকর আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর সাহায্য কামনা করব। যাতে তিনি শোকর আদায় করার তাওফিক দান করেন। আর যদি আল্লাহ তা'য়ালার লিখন আমার অনুকূলে না হয়, অর্থাৎ আমি যদি বাধা প্রাপ্ত হই তবে সেটা সেই ব্যক্তির অপরাধের জন্য নয়, যার উদ্দেশ্য সৎ এবং যার অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের পত্র এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য পরামর্শ

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হযরত হোসাইনের (রা) কুফায় রওয়ানার খবর পেয়ে একখানা পত্র লিখে তাঁর পুত্রকে হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রকে বললেন, অতিদ্রুত পৌছে পথে বসেই হযরত হোসাইন (রা)-কে এই পত্রখানা দিবে। পত্রের মর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমি আপনার কাছে আবেদন করছি যে, আপনি আমার পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আমি আপনার কল্যাণের জন্যই এই আবেদন করছি। আমি আপনার বিপদের আশংকা করছি। আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে এবং আপনার সাথীদেরকে শেষ করে দেয়া হবে। আল্লাহ না করুন, আপনি যদি শেষ হয়েই যান, তবে পৃথিবীর জ্যোতি নির্বাপিত হয়ে যাবে। কারণ, আপনি মুসলমানদের নেতা এবং একমাত্র আশার আলো। আপনি সামনে আর অগ্রসর হবেন না। পত্র প্রেরণ ছাড়া আমি নিজেও আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসছি। আমার অপেক্ষা করুন। ওয়াস সালাম। (ইবনে আসীর)

এই পত্র পাঠিয়ে দিয়ে, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) ইয়াযীদ কর্তৃক মক্কায় মনোনীত গর্ভনর আমর বিন সায়ীদের কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে বললেন, আপনি হযরত হোসাইনের (রা) জন্য একখানা 'নিরাপত্তার সনদ পত্র' লিখে দিন। আর আপনি লিখিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিন যে, "যদি হযরত হোসাইন (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন, তবে তাঁর সাথে সদাচারণ করা হবে।"

মক্কার গর্ভনর আমর বিন সায়ীদ 'নিরাপত্তার সনদ পত্র' লিখে দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন জাফরের (রা) সাথে তার ভাই ইয়াহ ইয়াহ বিন সায়ীদকেও হযরত হোসাইনের (রা) কাছে প্রেরণ করলেন। তারা দু'জন হযরত হোসাইনের (রা) সাথে পথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমর বিন সায়ীদের লেখা নিরাপত্তা পত্র তাঁকে পাঠ করে শুনালেন। হযরত হোসাইনকে (রা) ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা দু'জনে খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু হযরত হোসাইন (রা) কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি তাঁদের কাছে তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের কারণও পেশ করলেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্বপ্ন এবং দৃঢ় সংকল্পের কারণ

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁর তরফ থেকে আমাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্যই আমি যাচ্ছি।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, সে স্বপ্নটি কি? তিনি বললেন, আজ পর্যন্ত সে স্বপ্নটির কথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করিনি। আর এখনও করব না। আমি এটি গোপন রেখেই আমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে চলে যাব।
(কামিল ইবনে কাসীর– ১:৪)

একথা শুনে তাঁরা, হযরত হোসাইনের (রা) এই দৃঢ় সংকল্পের উপর আর কোন কথা বললেন না। অবশেষে তিনি কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর মোকাবিলা করার জন্য কুফার গর্ভনর ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি

হযরত হোসাইনের (রা) মোকাবিলার জন্য ইবনে যিয়াদকে যোগ্য ও কঠোর ব্যক্তি ধারণা করেই তাকে কুফার হাকিম (গর্ভনর) নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইবনে যিয়াদ হযরত হোসাইনের (রা) রওয়ানার খবর পেয়ে, তার পুলিশ বাহিনী প্রধান হোসাইন বিন নোমায়েরকে আগে প্রেরণ করলেন। যাতে সে কাদেসীয়ায় পৌছে হোসাইন (রা)-এর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। হযরত হোসাইন (রা) 'হাজের' নামক স্থানে পৌছে, কুফাবাসীদের কাছে একখানা পত্র লিখলেন এবং তা নিয়ে কায়েসকে কুফায় পাঠিয়ে দিলেন। সে পত্রে, তার আগমনের খবর এবং কুফাবাসীগণ তাঁকে যে উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার কথা লেখা ছিল।

পত্রবাহকের শাহাদত

কায়েস যখন এই পত্র নিয়ে কাদেসীয়া পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ইবনে যিয়াদের পুলিশ বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করলো। পুলিশ বাহিনী পূর্ব থেকেই এখানে হযরত হোসাইনের (রা) আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কায়েসকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের কাছে প্রেরণ করা হলো। ইবনে যিয়াদ কায়েসকে বলল, "তুমি রাজপ্রাসাদের ছাদে ওঠে হযরত হোসাইনকে (রা) গালি-গালাজ কর এবং তাঁকে অভিশাপ কর। (নাউজু বিল্লাহ)। কায়েস ছাদের ওপর উঠলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার হাম্‌দ ও সানা পাঠ করার পরে উচ্চস্বরে বললেন,

"হে কুফাবাসী! হযরত হোসাইন (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাহেবজাদা (পুত্র)। তিনি বর্তমান সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদের কাছে তাঁর প্রেরিত দূত। তিনি 'হাজের' নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌছে গেছেন। তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও।"

অতঃপর তিনি (কায়েস) ইবনে যিয়াদকে অকথ্য ভাষায় মন্দ বললেন এবং হযরত হোসাইনের (রা) জন্য আল্লাহর তা'য়ালার দরবারে দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করলেন।

ইবনে যিয়াদ তাঁর এই সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লো। সে তার কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিল, কায়েসকে রাজপ্রসাদের ছাদ থেকে নিচে নিক্ষেপ কর। জালিমরা তার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে নিচে নিক্ষেপ করলো। কায়েস শাহাদত বরণ করলেন। তাঁর দেহ টুকরা টুকরা হয়ে গেল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মুতীয়ের সাক্ষাৎ এবং ফিরে যেতে পরামর্শ

হযরত হোসাইন (রা) কুফার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে অকস্মাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মুতীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি হযরত হোসাইনকে (রা) দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কোরবান হোক! বলুন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?" হযরত হোসাইন (রা) তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরজ করলেন, "হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সন্তান! আমি আল্লাহ ও ইসলামের মর্যাদার ওসীলা দিয়ে বলছি যে, আপনি আপনার এই উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকুন। আমি আল্লাহর কসম এবং কুরআন ও আরবের সম্মানের ওসীলা দিয়ে বলছি যে, আপনি যদি বনু উমাইয়া থেকে, তাদের কর্তৃত্বকে নিতে চান, তবে তারা আপনাকে হত্যা করবে। আর আল্লাহ না করুন, তারা আপনাকে যদি শহীদ করেই দেয়, পৃথিবীতে তখন এমন আর কেউ বাকি থাকবে না, যাকে তারা ভয় করবে। খোদার কসম! আপনার বেঁচে থাকার সাথে, ইসলাম, কুরআন এবং গোটা আরব জাহানের মর্যাদা ও অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। আপনি এরূপ কাজ কখনও করবেন না। কুফায় গমন করে নিজের প্রাণ বনু উমাইয়াদের হাতে সমর্পণ না করার জন্য, আপনার কাছে বিনয়ের সাথে আবেদন করছি।" হযরত হোসাইন (রা) তাঁর যাত্রা বিরতি করলেন না। তিনি কুফার দিকে অগ্রসর হতেই লাগলেন। (ইবনে আমীর)

মুসলিম (রা)-এর হত্যার খবর পেয়ে হযরত হোসাইন (রা) কে সাথীদের পরামর্শ

মুসলিম বিন আকীল (রা) মুহাম্মদ বিন আস্ আসের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাঁর অবস্থা হযরত হোসাইনকে (রা) অবহিত করিয়ে, তাঁকে পথ থেকেই ফিরিয়ে দিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, মুহাম্মদ বিন আস্ আস এক লোকের মাধ্যমে হযরত হোসাইনকে (রা) মুসলিম বিন আকীলের অবস্থা অবহিত করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন আস্ আসের পত্র এবং মুসলিমের হত্যার খবর হযরত হোসাইন (রা) পেয়েছিলেন 'সায়ালাবীয়া' নামক স্থানে পৌছে। এ খবর শুনে, হযরত হোসাইনের (রা) কতিপয় সাথী হযরত হোসাইনকে (রা) জোর আরয করেন যে, আপনি এখন এখান থেকেই ফিরে যান। কারণ, কুফায় আপনার কোনই সাহায্যকারী নেই। আমাদের খুবই সন্দেহ হচ্ছে যে, যারা আপনাকে আহ্বান করেছে, তারাই আপনার মোকাবিলায় আসবে।

মুসলিম বিন আকীল (রা)-এর লোকদের উত্তেজনা

মুসলিম বিন আকীলের (রা) শাহাদতের খবর শুনে বনু আকীলের লোকজন উত্তেজিত হয়ে গেল। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা মুসলিম বিন আকীলের (রা) কিসাস্ (প্রতিশোধ) যেকোন ভাবেই হোক নিয়েই ছাড়ব। অথবা তাঁর মতই প্রাণ বিসর্জন করে দেব। হযরত হোসাইনও (রা) এখন বুঝতে পারলেন যে, কুফার পরিবেশ এখন তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। কুফায় এখন সেই পরিবেশ

নেই, যে উদ্দেশ্যে তিনি কুফা গমনের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু বনু আকীলের এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় এবং মুসলিম বিন আকীলের (রা) বিচ্ছেদে হযরত হোসাইন (রা) প্রভাবান্বিত হয়ে বললেন, এভাবে বেঁচে থাকায় কোনই কল্যাণ নেই। তাঁর সাথীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক বললেন, মুসলিম বিন আকীলের (রা) অনুপস্থিতিতে, আপনার প্রভাব এখন অন্য রকমের। আমাদের মনে হয় কুফাবাসী আপনাকে যখন দেখবে, তখন তারা আপনার সাথেই এসে যাবে। সুতরাং হযরত হোসাইন (রা) এসব কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। 'যিয়ালা' নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। পথ থেকে কিছু লোক হযরত হোসাইনের (রা) সাথী হয়েছিলেন। 'যিয়ালা' নামক স্থানে পৌছে হযরত হোসাইন (রা) খবর পেলেন যে, তার দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবনে লাকীত, যাকে মুসলিম বিন আকীলের (রা) কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

সাথীদের ফিরে যেতে অনুমতি

এই শাহাদতের খবর পেয়ে হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীয় লোকদেরকে সমবেত করে বললেন, "কুফাবাসী আমার সাথে পত্রপ্রতারণা করেছে। আমার অনুসারীরা আমার থেকে ফিরে গেছে। এখন যার ইচ্ছা, ফিরে যেতে পারেন। কারও দায়িত্ব আমি আমার নিজের ওপর বহন করতে চাই না।" হযরত হোসাইনের (রা) এই ঘোষণার পর, পথ থেকে দলভুক্ত হওয়া লোকগুলো ডানে বামে চলে গেল। এখন হযরত হোসাইনের (রা) সাথে শুধু সেই লোকগুলো থেকে গেলেন, যারা মক্কা থেকে তাঁর সাথী হয়ে এসেছেন। 'যিয়ালা' থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা 'ওক্‌বা' নামক স্থানে এসে পৌছলেন। সেখানে এক আরবীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি হযরত হোসাইনকে (রা) বললেন, "আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, আপনি ফিরে যান। আপনি তীর, বর্শা ও তলোয়ারের দিকে যাচ্ছেন। যারা আপনাকে আহ্বান করেছে, তারা যদি তাদের দুশমনদের সমর্থন না করত এবং তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বের করে দিয়ে আপনাকে আহ্বান করত, তখন আপনার সেখানে গমন করাটা সঠিক সিদ্ধান্ত হত। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে সেখানে যাওয়া আপনার জন্য আদৌ ঠিক নয়।"

হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "তুমি যা বলছ তা আমার কাছে গোপন নয়, কিন্তু আল্লাহর লিখনের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না।"

ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হুর বিন ইয়াযীদের এক হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীবৃন্দসহ পথ চলছেন। দ্বিপ্রহরের সময়, অনেক দূরে কি যেন দেখা যাচ্ছিল। গভীরভাবে দৃষ্টি করে বুঝা গেল যে, ঘোড় সাওয়ার এক বাহিনী তাঁদের দিকে আসছে। এ অবস্থায় হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীবৃন্দ একটি পাহাড়ের নিকটে পৌছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতি কাজে নিমগ্ন, ইত্যবসরে হুর বিন ইয়াযীদের নেতৃত্বাধীনে এক হাজার ঘোড় সাওয়ার সৈন্য মোকাবিলার জন্য এসে গেল। তারা এসে হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীবৃন্দের শিবিরের সামনে মুখোমুখি শিবির স্থাপন করল। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীবৃন্দকে বললেন, "তোমরা সকলে বেশি বেশি করে পানি পান করে নাও এবং তোমাদের ঘোড়াগুলোকেও পর্যাপ্ত পানি পান করাও।" অতঃপর জোহরের নামাযের সময় এসে গেল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর পিছনে দুশমনদের নামায আদায়

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর মুয়ায্‌যিনকে যোহরের আজান দিতে বললেন। সকলে নামাযের জন্য সমবেত হলেন। অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) তাঁর বিরোধী দলকে শুনানোর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ প্রদান করলেন। হামদ ও সালাতের পরে তিনি বললেন,

"হে লোকেরা! আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ও তোমাদের কাছে আমি এই অপারগতা প্রকাশ করছি যে, তোমাদের অনেক পত্র এবং প্রতিনিধি দল আমার কাছে প্রেরণ না করা পর্যন্ত, আমি এখানে আগমনের ইচ্ছা করিনি। যাতে বলা হয়েছিল যে, "এখন পর্যন্ত আমাদের কোন আমীর ও নেতা নিযুক্ত হয়নি। আপনি আসুন। আশা করি আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করবেন।"

আমি তোমাদের আহ্বানের ভিত্তিতে এখানে এসেছি। যদি এখনও তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতির ওপর কায়েম থাক, তবে আমি তোমাদের শহর কুফায় গমন করব। আর যদি তোমাদের মতের পরিবর্তন হয়ে থাকে, আর আমার আগমন তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে থাকে, তবে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাব।"

হযরত হোসাইনের (রা) এই ভাষণ শুনে সবাই চুপ হয়ে রইলেন। অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) মুয়াযযিনকে ইকামত দিতে বললেন এবং হুর বিন ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি তোমাদের সৈন্যসহ আলাদাভাবে নামায পড়বে, না আমাদের সাথে পড়বে ? হুর বললো, না, আপনিই নামায পড়ান। আমরা সবাই আপনার পিছনেই নামায পড়ব। হযরত হোসাইন (রা) জোহরের নামাযের ইমামতি করলেন। নামায শেষে তিনি তাঁর জায়গায় চলে গেলেন এবং হুর বিন ইয়াযীদ তার জায়গায় চলে গেল।

এরপরে আসরের নামাযের সময় এসে গেল। এ সময়ও হযরত হোসাইন (রা) ইমামতি করলেন। সবাই নামাযের জামাতে শরীক হলো। আসরের নামাযের পরে, হযরত হোসাইন (রা) পুনরায় এক ভাষণ প্রদান করেন।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত হোসাইন (রা)-এর দ্বিতীয় ভাষণ

হযরত হোসাইন (রা) ভাষণের প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন,

"হে লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যথাস্থানে বসাও, তবে সেটা আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির কারণ হবে। আমরা 'আহলে বাইত' এই খিলাফতের জন্য তাদের চেয়ে অধিক যোগ্য, যারা অবৈধ ভাবে এই খিলাফতের দাবি করছে এবং অন্যায়ভাবে তোমাদের ওপর শাসন করছে। যদি তোমরা আমাকে না পছন্দ কর, আমার যোগ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞত থাক, অথবা তোমাদের সিদ্ধান্তসমূহ যা বহু পত্রের মাধ্যমে এবং প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছিলে, তা যদি পরিবর্তন করে থাক, তবে আমি এখান থেকেই ফিরে যাব।" (ইবনে আসীর-১৯:৪)

এ সময় হুর বিন ইয়াযীদ বললো, এই পত্র ও প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে আমার কাছে কোনই খবর নেই। এগুলো কি এবং এগুলো কারা লিখেছে সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হযরত হোসাইন (রা) থলি থেকে অনেকগুলো পত্র তাদের সামনে বের করে দিলেন। হুর বললো, যাই হোক, আমরা এ পত্র লিখিনি। আমরা আমাদের আমীর কর্তৃক এই আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনাকে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছিয়ে দিব। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এরপরে, হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন, সাওয়ারী প্রস্তুত করে প্রত্যাবর্তন কর। এতে হুর বিন ইয়াযীদ বাধা দিলে, হযরত হোসাইন (রা) তাকে

সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কি চাও, তোমার মা তোমার জন্য চোখের পানি ঝরাবে ?" হুর বিন ইয়াযীদ বললো, "খোদার কসম! যদি আপনি ছাড়া অন্য আর কেউ আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করত, তবে আমি তাকে বুঝায়ে দিতাম এবং তার মায়ের নাম আমিও অনুরূপভাবে উচ্চারণ করতাম। কিন্তু আপনার মায়ের নাম অসম্মানের সাথে উচ্চারণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "আচ্ছা বলো, তোমার ইচ্ছা কি ?" হুর বিন ইয়াযীদ বললো, "আমার ইচ্ছা হলো এই যে, আপনাকে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছিয়ে দিব।" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "আমি তোমাদের সাথে কখনই যাব না।" হুর বললো, "খোদার কসম! আমিও আপনাকে ছাড়ব না।" এভাবে কিছুক্ষণ কথাপোকথন চলতে লাগলো।

হুর বিন ইয়াযীদের পরামর্শ

অতঃপর হুর বললো, আপনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনাকে কুফায় না পৌছনো পর্যন্ত আমি যেন আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন না হই। এখন আপনি একটি কাজ করতে পারেন যে, আপনি এমন একটি রাস্তা ধরুন, যেটি কুফার রাস্তাও নয় এবং মদীনারও নয়। এ অবস্থায় আমি ইবনে যিয়াদকে পত্র লিখবো। আর আপনিও ইয়াযীদ অথবা ইবনে যিয়াদের কাছে পত্র লিখবেন। এতে হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা করে দিবেন, যাতে আমি আপনার সাথে মোকাবিলা করা থেকে এবং আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি। এ পরামর্শ অনুযায়ী হযরত হোসাইন (রা) কাদেসীয়ার পথ ধরে বাম দিকে যেতে শুরু করেন। আর হুরও তার বাহিনীসহ হযরত হোসাইনের (রা) পিছনে পিছনে যেতে থাকেন। এ সময় হযরত হোসাইন (রা) এক ভাষণ প্রদান করেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর তৃতীয় ভাষণ

আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

"হে লোকেরা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন বাদশাহকে এই অবস্থায় দেখে যে, সে (বাদশাহ) আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ মনে করে, আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরোধী করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাদের প্রতি জুলুম করে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তখন সেই (দর্শক) ব্যক্তি, বাদশাহর এ কাজগুলো দেখে যদি তার কোন প্রকার

বিরোধিতা না করে, তবে আল্লাহ তা'য়ালার দায়িত্ব হচ্ছে, এই ব্যক্তিকেও বাদশাহর সাথে সেই স্থানে (জাহান্নামে) পৌছিয়ে দেয়া।

আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ইয়াযীদ ও তার পরিষদবর্গ শয়তানের অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহর অনুসরণকে ছেড়ে দিয়েছে। তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহর সীমাকে লজ্ঘন করেছে। আর ইসলামী বায়তুলমাল (জাতীয় সম্পদ)-কে নিজ সম্পদ মনে করছে এবং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ এবং বৈধকে অবৈধ নির্ধারণ করেছে।

আমি খিলাফতের জন্য অন্যদের চেয়ে অধিক হকদার। আমি তোমাদের পত্র এবং প্রেরীত প্রতিনিধির মধ্যেমে তোমাদের বাইয়াতের খবর পেয়েছি। তোমরা আমাকে জানিয়েছ যে, তোমরা আমার সাথে সর্বদাই থাকবে এবং আমার জীবনকে তোমাদের জীবনের মতই মনে করবে। যদি তোমরা তোমাদের বাইয়াতের ওপর কায়েম থাক, তবে সঠিক পথ পাবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা এবং হযরত ফাতিমার (রা) পুত্র। আমার জীবন তোমাদের সাথে এবং আমার পরিবার-পরিজনও তোমাদের পরিবার-পরিজনের সাথে সম্পৃক্ত। তোমাদের আমার অনুসরণ করা উচিত।

আর যদি তোমরা এরূপ না করে বাইয়াতকে প্রত্যাখ্যান কর এবং আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা ভঙ্গ কর, তবে সেটা তোমাদের থেকে বৈচিত্র্যের কিছুই নয়। কারণ, তোমরা এরূপ আচরণ আমার পিতা হযরত আলী (রা), আমার ভাই হযরত হাসান (রা) এবং আমার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলের (রা) সাথেও করেছ। যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে ধোকা খেয়েছে, তিনি মহা প্রতারণার স্বীকার হয়েছে। সুতরাং তোমরা নিজেরাই তোমাদের পরকালকে নষ্ট করেছ এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ। অতিশীঘ্রই আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করবেন। ওয়াস্ সালাম।"

(ইবনে আসীর)

ইবনে ইয়াযীদ নিজে এই ভাষণ শুনে বললো, "আমি আপনাকে আপনার জীবনের ব্যাপারে খোদার কসম দিচ্ছি। কারণ, এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, যদি আপনি মোকাবিলায় আসেন, তবে নিহত হয়ে যাবেন।" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "আপনি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাতে চান ? আমি যা বলছি, সেদিকে আপনি আদৌ দৃষ্টিপাত করছেন না। আমি আপনার কথার জবাবে, শুধু সেই সাহাবীর উক্তিটিই বলব, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যের জন্য বের হয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই যখন তাকে বলেছিলেন যে, তুমি

কোথায় যাচ্ছ ? তুমি কি নিহত হবে তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের জবাবে বলেছিলেন—

سأمضى وما بلموت عار على الفتى # اذا مانوى خيرا

وجاهد مسلما فان عشت لم اندم وان مت لم الم # كفى بك ذلا ان

تعيش وترغما

"আমি আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করব। মৃত্যু সেই যুবকের জন্য কখনই ভয়ের কারণ নয়, যখন সে (যুবক) সৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর রাস্তায় জিহাদে অবতীর্ণ হন। যদি আমি জীবিত থাকি, তবে আমি লাঞ্ছিত হব না। আর যদি নিহত হই, তবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার পাত্র হব না। তোমাদের জন্য এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে যে, তোমরা লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করছ।"

হুর বিন ইয়াযীদের অন্তরে প্রথম থেকেই আহলে বাইয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তদুপরি এই ভাষণে আরও একটু প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ল। সে হযরত হোসাইনের (রা) কথা শুনে তাঁর থেকে আলাদা হয়ে চলতে লাগল।

তারমাহ্ বিন আদীর রণাঙ্গনে উপস্থিতি

এ সময় কুফা থেকে চার ব্যক্তি হযরত হোসাইনের (রা) সাহায্যের জন্য সেখানে পৌঁছলেন। এদের সর্দার ছিলেন তারমাহ্ বিন আদী। হুর বিন ইয়াযীদ চাইলেন যে, হয় তাঁকে গ্রেফতার করবেন, না হয় তাঁকে ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু হযরত হোসাইন (রা) বললেন, এই ব্যক্তি (তারমাহ বিন আদী) আমার সাহায্যকারী ও বন্ধু। তাঁকে সেভাবেই হেফাজত করবো, যেভাবে আমি আমার নিজ প্রাণকে হেফাজত করে থাকি। হুর বিন ইয়াযীদ তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন।

হযরত হোসাইন (রা) তাঁদের কাছে কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, কুফার নেতৃস্থানীয় লোকদের থলি অর্থ-কড়ি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তারা অর্থের লোভে আপনার বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অন্তর আপনার সাথেই রয়েছে। তবে এর পরেও, যখন মোকাবিলা হবে, তখন তাদেরও তলোয়ার আপনার মোকাবিলায় এসে যাবে।

তারমাহ বিন আদীর পরামর্শ

তারমাহ্ বিন আদী হযরত হোসাইনের (রা) কাছে এসে পরিস্থিতি এরূপ দেখে বললেন, "আমি দেখছি, আপনার সাথে কোন শক্তিশালী দল নেই। আপনার মোকাবিলা করার জন্য হুর বিন ইয়াযীদের সৈন্যরাই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাদের সাথে যদি আর কোন সৈন্য নাও আসে, তবুও তাদেরকে আপনি পরাজিত করতে পারবেন না।

আমি কুফা থেকে রওয়ানা করার মুহূর্তে, আপনার মোকাবিলা করার জন্য এমন এক বিশাল বাহিনী দেখতে পেলাম, যা ইতোপূর্বে আমি আর দেখিনি। আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আর এক কদমও সামনে অগ্রসর হবেন না। আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে এক নিরাপদ দুর্গে পৌঁছিয়ে দিব। আমি গাস্‌সান রাজা এবং লোকমান বিন মানযারের মোকাবিলার সময় সেই দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি সেখানে থেকে কামিয়াব হয়েছি। আপনি সেখানে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। আপনি সেই দুর্গে অবস্থানকারী আজা এবং সালমা গোত্রদ্বয়কে ডাকবেন। আল্লাহর কসম! দশ দিনের মধ্যেই সেই গোত্রের লোকেরা পদব্রজে ও সাওয়ারীতে আরোহন করে আপনার সাহায্যের জন্য এসে যাবে। এ সময় যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনি মোকাবিলা করবেন, তখন আমি আপনার সাহায্যের জন্য বিশ হাজার বীর নওজোয়ানকে প্রেরণের ব্যবস্থা করব। যারা আপনার সামনে তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে দেখাবে।

তাদের প্রাণ থাকা পর্যন্ত আপনার সামনে কেউই পৌঁছতে পারবে না। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে এবং আপনার কওমের লোকদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কিন্তু হুর বিন ইয়াযীদের সাথে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই চেষ্টা করব। আমার কি হবে, সেটা আমারও জানা নেই। এখন তার সাথেই আমার চলতে হবে।

তারমাহ বিন আদী, হযরত হোসাইন (রা) থেকে এই বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন যে, "আমি খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য জরুরী আসবাবপত্র নিয়ে পুনরায় আপনার কাছে আসছি। পরে তিনি এসেও ছিলেন। কিন্তু পথে বসে হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের মিথ্যা খবর শুনে তিনি ফিরে যান।

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্বপ্ন

হযরত হোসাইন (রা) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। 'নাযরে বনী মুকাতিল' পর্যন্ত পৌছে একটু বিশ্রাম নিলেন এবং সেখানে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তিনি "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" পাঠ করতে করতে তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হলেন।

হযরত হোসাইনের (রা) সাহেবজাদা আলী আকবর (রা) এই অবস্থা দেখে ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আব্বাজান! কি ব্যাপার ?" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম যে, কোন এক ঘোড় সাওয়ার আমার কাছে এসে বলছে যে, কতিপয় লোক এরূপ অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে যে, মৃত্যুও তাঁদের সাথে সাথে চলছে। আমি এই স্বপ্নের দ্বারা বুঝতে পেরেছি যে, এটা আমার মৃত্যুরই খবর।

সাহেবজাদার আত্মবিশ্বাস

সাহেবজাদা আলী আকবর (রা) আরয করলেন, "আব্বাজান! আমরা কি সত্যের উপর নই ?" হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যার দিকে সকলকেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে,ত্তা নিশ্চয়ই আমরা সত্যের ওপর রয়েছি।" সাহেবজাদা বললেন, "তবে আমাদের ভয় কিসের ? আমরাতো সত্যের ওপর থেকে মৃত্যুবরণ করছি।" হযরত হোসাইন (রা) পুত্রকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তুমি তোমার পিতার যথাযথ হক আদায় করেছ।" অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যখন 'নাইনওয়ী' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, কুফা থেকে এক ঘোড় সাওয়ার আসছে। তাঁরা সবাই তার প্রতীক্ষায় সেখানে অবতরণ করলেন। সে (ঘোড় সাওয়ার) এসে শুধু হুর বিন ইয়াযীদকে সালাম দিল এবং ইবনে যিয়াদের একখানা চিঠি তার কাছে পৌছাল। এতে লেখা ছিল যে,

"আমার এই পত্র পাওয়ার সাথে সাথে তুমি হোসাইনের (রা) ময়দান সংকীর্ণ করে দিবে। অর্থাৎ তাঁকে উন্মুক্ত ময়দান ব্যতীত অন্য কোন নিরাপদ ময়দানে অবতরণ করতে দিবে না। তাঁকে এমন ময়দানে অবতরণ করতে দিবে, যেখানে পানি শূন্য। আর আমি এই দূতকে এই নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তোমার থেকে চলে না আসে।

হুর বিন ইয়াযীদ এই পত্র পাঠ করে হযরত হোসাইনকে পত্রের মর্ম শুনালেন এবং তার অপারগতার কথা প্রকাশ করলেন। সে বললেন, ইবনে যিয়াদ আমাকে

পর্যবেক্ষণ করার জন্য গুপ্তচর নিয়োজিত করেছে। এখন আপনার সাথে কোন প্রকার আপোষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

যুদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত হোসাইন (রা)-এর অভিমত

এই পরিস্থিতিতে হযরত হোসাইনের (রা) সাথীদের মধ্য হতে যোহায়ের বিন আলকাইন (রা) হযরত হোসাইনের (রা) কাছে আরয করলেন, আপনি দেখছেন যে, আমরা ক্রমশঃই বিপদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামনে যে বিপদ আসছে তার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধের ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রেয়। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আমি প্রথমে যুদ্ধে দিকে অগ্রসর হতে চাই না। যোবায়ের (রা) বললেন; আপনি যদি প্রথম যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহী না হন,তবে আমাদেরকে নিয়ে এমন একটি স্থানে চলুন, যে স্থানটি নিরাপদ এবং ফোরাত নদী থেকে নিকটতম। সেই স্থানে যেতে যদি তারা বাধা প্রদান করে, তবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরূপ নিরাপদ স্থান কোথায় আছে ? বলা হলো, 'আকর' নামক স্থানটি নিরাপদ। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আমি 'আকর' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। 'আকর' শব্দের আভিধানিক অর্থ ধ্বংস।

ওমর বিন সাদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে মোকাবিলার জন্য উপস্থিত

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর সাথীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ করছেন; ঠিক সেই মুহূর্তে ইবনে যিয়াদ ওমর বিন সাদকে চার হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করে। ওমর বিন সাদ সব সময়ই চাইতেন যে, তিনি যেন হযরত হোসাইনের (রা) সাথে যুদ্ধ করার কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পান। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে জোর করে হযরত হোসাইনের (রা) মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। ওমর বিন সাদ হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পৌছে, তাঁর কুফায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত হোসাইন (রা) সব ঘটনা তার কাছে বললেন। তিনি তাকে একথাও জানালেন যে, কুফাবাসীর আহ্বানে আমি এখানে এসেছি। এখন যদি তাদের সিদ্ধান্ত তারা পরিবর্তন করে অর্থাৎ আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত।

ওমর বিন সাদ, ইবনে যিয়াদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, "হোসাইন (রা) কুফা ত্যাগ করতে প্রস্তুত।"

হযরত হোসাইন (রা) কে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ

ইবনে যিয়াদ, ওমর বিন সাদের পত্রের জবাবে লিখে পাঠাল যে, হোসাইনের (রা) কাছে শুধু একটি প্রস্তাবই রাখো যে, সে ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। যদি সে এ প্রস্তাবে রাজী হয়, তবে আমরা চিন্তা করবো যে, তাঁর ব্যাপারে কি করা যায়। আর ওমরকে এই নির্দেশ দেয়া হলো যে, হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদেরকে একেবারেই পানি সরবরাহ করা বন্ধ করে দাও। এই ঘটনা হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের তিন দিন পূর্বের। ইবনে যিয়াদের নির্দেশে এই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে পানি সরবরাহ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেয়া হলো। যখন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দারা পানির তৃষ্ণায় পেরেশান হয়ে পড়লেন তখন হযরত হোসাইন (রা) তাঁর ভাই আব্বাস ইবনে আলীকে ত্রিশজন সাওয়ার ও ত্রিশজন পদাতিক সৈন্যসহ পানি সংগ্রহের জন্য শিবিরের বাইরে প্রেরণ করলেন। পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে ওমর বিন সাদের সৈন্যদের সাথে মোকাবিলাও হলো। অবশেষে বিশ মশক পানি নিয়ে তাঁরা শিবিরে ফিরে আসেন।

হযরত হোসাইন (রা) ও ওমর বিন সাদের সাক্ষাৎ ও কথোপোকথন

এই ঘটনার পর হযরত হোসাইন (রা) ওমর বিন সাদের কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, আজ রাতে আপনার ও আপনার সৈন্যদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। সাক্ষাতের সুযোগ পেলে আমি আপনাদের সামনে কিছু প্রস্তাব পেশ করবো। ওমর বিন সাদ এই পয়গাম অনুযায়ী রাতে হযরত হোসাইনের (রা) সাথে এসে সাক্ষাৎ করেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর তিনটি প্রস্তাব

হযরত হোসাইন (রা) ওমর বিন সাদের কাছে বললেন, আমার ব্যাপারে আমি তিনটি প্রস্তাব আপনার কাছে পেশ করছি। এর মধ্য হতে যে কোন একটি গ্রহণ করুন।

১। আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই চলে যাব।

২। অথবা, আমাকে ইয়াযীদের কাছে নিয়ে চলুন। আমি নিজে তার সাথে আলোচনা করে আমার ব্যাপারে ফয়সালা করে নিব।

৩। অথবা, আমাকে কোন মুসলিম দেশের সীমান্তে পৌঁছেয়ে দিন। আমি সেখানের সাধারণ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করবো।

কতিপয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরত হোসাইন (রা) শেষক্ত দুটি প্রস্তাব দেননি। তিনি শুধু প্রথম প্রস্তাবই দিয়েছিলেন।

ওমর বিন সাদ হযরত হোসাইনের (রা) এই কথা শুনে ইবনে যিয়াদের কাছে পত্র লিখলেন। পত্রের মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যমত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। হযরত হোসাইন (রা) তিনটি প্রস্তাব আমার কাছে পেশ করেছেন। আমার ধারণা, এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং মুসলিম জাতি মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

ইবনে যিয়াদের সম্মতি ও শমরের বিরোধিতা

ওমর বিন সাদের এই পত্রে ইবনে যিয়াদ কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে বললেন, "এই পত্র এমন এক ব্যক্তির যিনি আমীরের অনুগত এবং নিজ কওমের কল্যাণকামী। আমি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলাম।"

শমর যীল জুসন, ইবনে যিয়াদকে বলল, আপনি কি হোসাইনকে (রা) এই সুযোগ দিতে চান যে, সে শক্তি অর্জন করে পুনরায় আপনার মোকাবিলায় এগিয়ে আসবে। সে যদি এই মুহূর্তে আপনার হাতছাড়া হয়ে যায়, পরে তাঁর আর নাগাল পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয়, এখানে ওমর বিন সাদের কিছুটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছি যে, ওমর এবং হোসাইন (রা) রাতের বেলা পরস্পরে মিলিত হয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করে থাকে।

হ্যাঁ, আপনি হোসাইনকে (রা) আপনার কাছে আসতে বলতে পারেন। এরপরে আপনি হয় তাঁকে শাস্তি দিবেন, না হয় ক্ষমা করে দিবেন।

ইবনে যিয়াদ শমরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে ওমর বিন সাদকে এই মর্মে পত্র লিখল এবং সেই পত্রসহ শমরকে ওমরের কাছে প্রেরণ করল। শমরকে বলে দিল যে, যদি ওমর বিন সাদ আমার এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর না করে, তবে তুমি তাকে হত্যা করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত তুমিই হবে।

ওমর বিন সাদের নামে ইবনে যিয়াদের পত্র

ইবনে যিয়াদ ওমর বিন সাদের কাছে যে পত্রটি লিখেছিলে সেটি নিম্নরূপ ঃ

"আমি তোমাকে এজন্য প্রেরণ করিনি যে, তুমি যুদ্ধকে এড়িয়ে যাবে, অথবা

হোসাইনকে (রা) সুযোগ দিবে, অথবা তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করবে। যদি হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীবৃন্দ আমার সাথে সন্ধি করতে চান, তবে সেজন্য তাঁদেরকে আমার কাছে উপস্থিত হতে হবে। তুমি তাঁদেরকে নিরাপত্তার সাথে আমার এখানে পৌছিয়ে দাও। অন্যথায় তাঁদের সাথে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে হত্যা করো, তাঁদের মৃতদেহ খন্ড-বিখন্ড করে ঘোড়ার খুর দ্বারা পিষ্ট করে ফেল। কারণ, তাঁরা এ শাস্তির যোগ্য। যদি তুমি আমার এই নির্দেশ পালন করো, তবে তোমাকে এই আনুগত্যতার জন্য পুরস্কার দেয়া হবে। আর যদি পালন না করো, তবে শমরের কাছে দায়িত্ব ন্যস্ত করবে।"

শমরের এই নির্দেশনামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে তার খেয়াল হলো যে, হযরত হোসাইনের (রা) সাথীদের মধ্যে তার ফুফাতো ভাই আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ, জাফর ও ওসমান রয়েছেন। সুতরাং সে ইবনে যিয়াদের কাছে এই চারজনের জন্য নিরাপত্তার আবেদন করে রওয়ানা হলো। শমর, এই নিরাপত্তানামাটি একজন দূতের মাধ্যমে সেই চারজনের কাছে পাঠিয়ে দিল। নিরাপত্তানামাটি দেখে চারজন একমত হয়েই বলে দিলেন যে, "আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানকে নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। সুতরাং আমাদের এই নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। তোমাদের নিরাপত্তার চেয়ে আল্লাহর নিরাপত্তাই অতি উত্তম। তোমার ওপর এবং তোমার নিরাপত্তার ওপর অভিশাপ।"

ইবনে যিয়াদের পত্র নিয়ে শমর যখন ওমর বিন সাদের কাছে পৌছল তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শমরের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ওমর বিন সাদ শমরকে বললেন, তুমি মহা অন্যায়কারী। তুমি মুসলমানদের ঐক্যে ফাঁটল লাগিয়ে দিয়েছ এবং যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছ। অবশেষে এই নির্দেশনামা হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পৌছান হলো। তিনি এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বললেন, "এই অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।"

হযরত হোসাইন (রা)-এর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা

শমর যিল জুমন এই পয়গাম নিয়ে মহররমের নবম তারিখে হযরত হোসাইনের (রা) কাছে পৌছে। এ সময় ইমাম হোসাইন (রা) তাঁর তাঁবুর সামনে ছিলেন। এ বসা অবস্থায়ই তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটি আওয়াজ দিয়ে জাগ্রত হয়ে গেলেন। হযরত যয়নব (রা) এই আওয়াজ শুনে দৌড়ে তাঁর কাছে আসলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বলছেন, "তুমি শীঘ্রই আমার কাছে আসছ।"

তার বোন হযরত যয়নব (রা) একথা শুনে কেঁদে দিলেন। হযরত হোসাইন (রা) তাঁকে শান্ত্বনা দিলেন। এ সময়ই শমরের সৈন্যবাহিনী হযরত হোসাইনের (রা) সামনে এসে উপস্থিত হলো। আব্বাস (রা) সামনে অগ্রসর হলেন। প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা হলো। কিন্তু তারা কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে দিলো। আব্বাস (রা) শিবিরে এসে হযরত হোসাইনকে (রা) বিষয়টি অবহিত করলেন।

ইবাদাতের জন্য এক রাতের সময় নিলেন হযরত হোসাইন (রা)

হযরত হোসাইন (রা) আব্বাসকে (রা) বলেন, তাদের কাছে গিয়ে আজকের রাতের জন্য যুদ্ধ মুলতবী রাখতে বলুন। যাতে আজ রাতে আমি আসিয়ত, নামায, দোয়া ও ইস্তেগফার করতে পারি। শমর এবং ওমর বিন সাদ তাদের লোকজনের সাথে পরামর্শ করে হযরত হোসাইনকে (রা) এই সুযোগ দিয়ে এক রাতের জন্য যুদ্ধ মুলতবী রাখলো।

আহ্‌লে বাইতের সামনে হযরত হোসাইন (রা)-এর ভাষণ

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদেরকে সমবেত করে এক ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, "আমি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করি। হে আল্লাহ! আমি আপনার শোকর আদায় করছি, আপনি আমাকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছেন, যার দ্বারা আমি আপনার বাণী বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাকে কুরআন শিখিয়েছেন এবং দ্বীনের বুঝ দান করেছেন। আপনি আমাকে আপনার কৃতজ্ঞশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

অতঃপর বললেন, "আমার জানামতে আমার সাথীদের ন্যায় এরূপ প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং নিবেদিত প্রাণ সাথী অন্য আর কারও নেই এবং আমার পরিবার পরিজনের মত দৃঢ় ও আস্থাশীল পরিবার অন্য আর কারও নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমার মনে হচ্ছে যে, আগামীকাল আমার শেষ দিন। আমি আপনাদেরকে মনের থেকে অনুমতি দিচ্ছি, এই রাতের অন্ধকারেই আপনারা যে কোন আশ্রয়

স্থলে চলে যান। আর আমার পরিবারের লোকদেরও হাত ধরে ধরে আপনারা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

শত্রুদের লক্ষ্য আমিই। আমাকে যদি পেয়ে যায়, তবে তারা আর অন্যের প্রতি দৃষ্টি করবে না।"

হযরত হোসাইনের (রা) এই বক্তব্য শুনে তাঁর ভাই, সন্তান ও ভাতিজাগণ এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফরের পুত্র এক বাক্যে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা কখনও এরূপ করব না। আপনার পরে আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদেরকে জীবিত না রাখেন।

অতঃপর বনু আকীলকে সম্বোধন করে হযরত হোসাইন (রা) বললেন, তোমাদের এক সম্মানিত ব্যক্তি মুসলিম বিন আকীল শহীদ হয়ে গেছেন, সেটাই যথেষ্ট। তোমরা সকলে চলে যাও। আমি তোমাদের খুশী মনে অনুমতি দিলাম।

তাঁরা বললেন, আমরা কিভাবে লোকদেরকে মুখ দেখাব যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুর সামনে রেখে আমরা আমাদের প্রাণকে রক্ষা করে চলে আসছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনার জন্য আমাদের প্রাণ, সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে দিব।

মুসলিম বিন উসজা অনুরূপ এক উত্তেজিত বক্তব্য প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "আপনার সামনে যুদ্ধ করে আমরা আমাদের প্রাণ দিয়ে দিবো।"

তাঁর বোন হযরত যয়নব (রা) পেরেশান হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত হোসাইন (রা) তাঁকে শান্ত্বনা দিলেন এবং এক অসিয়ত করলেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর অসিয়ত

হে আমার বোন! আমি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, তুমি আমার শাহাদতে কখনও বুক থাপরিয়ে অথবা কাপড় ছিঁড়ে ক্রন্দন করবে না। আর জোর আওয়াজেও চীৎকার করে কাঁদবে না। এই অসিয়ত করে হযরত হোসাইন (রা) শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর সাথীদেরকে সমবেত করে সারা রাত তাহাজ্জদ, দোয়া ও ইস্তেগফারে মাশগুল রইলেন। এ রাতটি ছিল আশুরার রাত। সকাল বেলা আশুরার দিন। এ দিনটি ছিল জুময়ার দিন। কারো মতে, এ দিনটি ছিল শনিবার। ফজরের নামায শেষেই ওমর বিন সাদ সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত হোসাইনের (রা) সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেল। হযরত হোসাইনের (রা) সাথে এসময় ছিল বাহাত্তর জন সাথী, তেইশ জন সাওয়ার এবং চল্লিশজন পদাতিক সৈন্য। হযরত হোসাইন (রা) মোকাবিলার জন্য তাঁর সাথীদেরকে কাতার বন্দী করলেন।

হুর বিন ইয়াযীদের অনুশোচনা ও হযরত হোসাইন (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন

ওমর বিন সাদ তার সৈন্যবাহিনীকে চারটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য একজন আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করেছিলেন। তার মধ্য হতে একদলের আমীর ছিলেন হুর বিন ইয়াযীদ। তিনি সর্ব প্রথম এক হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত হোসাইনের মোকাবিলার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং হযরত হোসাইনের (রা) সাথে সাথেই চলছিলেন। এসময় তাঁর অন্তরে আহলে বাইয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগরিত হলো। তিনি তাঁর পূর্বের কৃত কর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

হুর বিন ইয়াযীদ এক ফাঁকে হযরত হোসাইনের (রা) সাথে দেখা করে আরয করলেন যে, "আমার প্রাথমিক গাফ্‌লাতী এবং আপনাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ না করে দেয়ার ফলেই আজকের এই কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার আদৌ ধারণা ছিল না যে, আপনার বিরুদ্ধে তারা এতখানি সীমা লঙ্ঘন করবে এবং আপনার কোন কথাকেই তারা মেনে নিবে না। যদি আমি এগুলো বুঝতে পারতাম, তবে আপনাকে আমি ফিরে যেতে বাধা দিতাম না। আমি এখন অনুতপ্ত হয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। এখন আমার শাস্তি ও তওবা এটাই যে, আমিও আপনার সাথে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করে দিব।" হুর বিন ইয়াযীদ তাঁর কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

উভয় বাহিনীর মোকাবিলায় হযরত হোসাইন (রা)-এর ভাষণ

উভয় বাহিনী মুখোমুখি। এসময় হযরত হোসাইন (রা) ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং সৈন্যবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে লোকেরা! আমার কথাগুলো শোন। দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না। আমাকে সুযোগ দাও, যাতে আমি তোমাদেরকে সে উপদেশগুলো দিতে পারি যেগুলো দেয়া আমার দায়িত্ব এবং এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্য তোমাদের কাছে পেশ করতে পারি। অতঃপর যদি তোমরা আমার অপারগতা গ্রহণ করো এবং আমার কথাকে সত্য মনে করো এবং আমার প্রতি ইনসাফ করো, তবে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরপরে আমার সাথে যুদ্ধ করার তোমাদের কোনই প্রয়োজন পড়ে না। আর যদি আমার এই অপারগতা

তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যই না হয়, তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই সেই মহান আল্লাহ আমার সাহায্যকারী, যিনি পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি (আল্লাহ) পুণ্যবানদের সাহায্য করেন।

বোনদের আহাজারি

হযরত হোসাইনের (রা) এই ভাষণ শিবিরে অবস্থানরত তাঁর বোনেরা ও অন্যান্য মহিলার শুনতে পেলেন। তাঁরা সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর ভাই আব্বাসকে (রা) তাদেরকে থামানোর জন্য শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ইবনে আব্বাসের (রা) ওপর রহম করুন। তিনি আমাকে সঠিক কথা বলেছিলেন যে, মহিলাদেরকে সাথে নিবেন না।

হযরত হোসাইন (রা)-এর হৃদয় বিদারক ভাষণ

হযরত হোসাইন (রা) শত্রুবাহিনীকে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে এবং শিবিরে অবস্থানরত মহিলাদের ক্রন্দনকে থামিয়ে দিয়ে এক হৃদয় বিদারক ভাষণ প্রদান করলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেন। অতঃপর বলেন ঃ

"হে লোকেরা! তোমরা আমার বংশের প্রতি নজর করে দেখ, আমি কে ? তোমরা গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবে, আমাকে হত্যা করা অথবা আমাকে অসম্মানিত করা তোমাদের জন্য কি ঠিক হবে ? আমি কি তোমাদের নবীর (রা) কন্যার পুত্র নই ? আমি কি তাঁর পুত্র নই, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ? শহীদদের সর্দার হামযাহ আমার পিতার কি চাচা ছিলেন না ? জাফর (রা) আমার কি চাচা ছিলেন না ? তোমাদের কাছে কি এই মাশহুর (বিখ্যাত) হাদিসটি পৌছেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং আমার ভাই হাসানকে (রা) জান্নাতী যুবকদের সর্দার বলেছেন। তোমরা আমার কথাকে বিশ্বাস করো। আল্লাহর কসম! আমার কথা একেবারেই সত্য। আমি যখন অবগত হয়েছি যে, মিথ্যা কথায় আল্লাহ নারাজ হন, তখন থেকে আমি কোন দিন মিথ্যা কথা বলিনি। যদি তোমরা আমার কথাকে বিশ্বাস না করো, তবে তোমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাদের থেকে তোমরা আমার কথার সত্যতার ব্যাপারে জেনে নিতে পারো। তোমরা

জিজ্ঞাসা করো জাফর ইবনে আবদুল্লাহর কাছে। জিজ্ঞাসা করো আবু সায়ীদ, হল বিন সাদ ও যায়েদ বিন (আরকামের) কাছে। তাঁরা তোমাদেরকে বলে দিবে যে, নিশ্চয়ই তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বাণী শুনেছেন। আমাকে হত্যা না করার জন্য এগুলো কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? তোমরা আমাকে বলো, আমি কাউকে কি হত্যা করেছি, যার বিনিময় তোমরা আমাকে হত্যা করবে ? আমি কি কারো সম্পদ হরণ করে নিয়েছি, অথবা কাউকে আঘাত করেছি ?"

অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) কুফার নেতৃবৃন্দের নাম ডেকে ডেকে বললেন, হে শীস্ বিন রাবী, হে হুজ্জাজ বিন আবহার, হে কায়িস বিন আস আস, হে যায়িদ বিন হারিস, তোমরা কি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার কাছে পত্র লিখনি ? তারা সবাই অস্বীকার করে বললো যে, আমরা লিখিনি। হযরত হোসাইন (রা) বললেন, আমার কাছে তোমাদের পত্র সংরক্ষিত রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন,

"হে লোকেরা! যদি তোমরা আমার এই আগমনকে অপছন্দ করে থাক, তবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এক নিরাপদ স্থানে চলে যাই।"

কায়িস বিন আস্ আস্ বললো, "আপনি আপনার চাচাতো ভাই ইবনে যিয়াদের নির্দেশকে কেন মেনে নিচ্ছেন না ? তিনি তো আপনারই ভাই। তিনি আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন না।"

হযরত হোসাইন (রা) বললেন, মুসলিম বিন আকীলের (রা) হত্যার পরেও তোমাদের এই ধারণা ? আল্লাহর কসম! আমি কখনই তার নির্দেশকে মেনে নিব না। এই কথা বলে হযরত হোসাইন (রা) ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন।

অতঃপর যোহায়ের বিন আলকাইন (রা) দাঁড়িয়ে তাদেরকে উপদেশ দিলেন যে, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওলাদকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকো। আর যদি তোমরা এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত না থাকো এবং ইবনে যিয়াদের অনুসরণ করো, তবে ভাল করে জেনে রাখো যে, ইবনে যিয়াদ থেকে কোন কল্যাণই তোমরা লাভ করবে না। সে তোমাদেরকেও হত্যা করবে। তারা যোহায়েরকে খুব ভর্ৎসনা করলো এবং ইবনে যিয়াদের খুব প্রশংসা করে বললো যে, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌছাব। যোহায়ের পুনরায় বললেন, হে জালিম সম্প্রদায়! এখনও সচেতন হও।

হযরত ফাতিমার (রা) পুত্র হযরত হোসাইন (রা) যিয়াদের চাইতে, ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার সঠিক যোগ্য। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য করতে

অপারগ হও, তবে তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই ইয়াযীদের কাছে সমর্পণ করো। তারা পরস্পরে বিষয়টি সুষ্ঠু ফয়সালা করে নিবেন। আল্লাহর কসম! ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া এতে তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। এই আলাপ-আলোচনা চলার মধ্যেই শমর প্রথমে অকস্মাৎ হযরত হোসাইনের (রা) ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। অতঃপর হুর বিন ইয়াযীদ (রঃ) যিনি অনুতপ্ত হয়ে হযরত হোসাইনের (রা) দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

"হে কুফাবাসী! তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও। তোমরা কি হযরত হোসাইনকে (রা) হত্যা করার জন্য আহ্বান করেছিলে? তোমরা তো তাঁকে পত্রের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, আমরা আমাদের জান ও মাল আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিবো। আর এখন তোমরাই তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছ। এমনকি তাঁকে এই অনুমতি পর্যন্ত দিতে রাজী হচ্ছ না যে, তিনি আল্লাহর এই প্রশস্ত যমীনের এমন এক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিবেন, যে স্থানটি তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য নিরাপদ। তোমরা এই সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সাধারণ বন্দীদের মত আচরণ করছ। ফোরাত নদীর পানি তাঁর জন্য বন্ধ করে দিয়েছো। অথচ সেই নদীর পানি ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকরা সকলেই পান করছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর পরিবার-পরিজন পানির পিপাসায় ছটফট করছেন। তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে, তাঁর আওলাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছ? যদি তোমরা এই অন্যায় আচরণ থেকে বিরত না হও এবং তওবা না করো, তবে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তৃষ্ণার্ত রাখবেন।"

হুর বিন ইয়াযীদের এই কথা শুনে তাঁর ওপরও তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। তিনি হযরত হোসাইনের (রা) সামনে একা দাঁড়িয়ে গেলেন। এর পরেই তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো এবং প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধে বিরোধী দলের অনেক লোকই নিহত হলো। হযরত হোসাইনের (রা) কতিপয় সাথীও শহীদ হলেন। হুর বিন ইয়াযীদ হযরত হোসাইনের (রা) পক্ষে শত্রুদের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বহু শত্রুকে হত্যা করলেন। মুসলিম বিন উস্জা (রা) আহত হয়ে পড়ে গেলেন। হাবীব বিন মুতাহ্হার (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, "তোমার জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ। অতঃপর মুসলিম (রা) হযরত হোসাইনের (রা) প্রতি ইঙ্গিত করে এক অসিয়ত করলেন যে, "তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত যেন তাঁর যথাযথ হেফাজাত করা হয়।"

এরপরে পাপিষ্ঠ ও নির্লজ্জ শমর, চারদিকে থেকে হযরত হোসাইন (রা) ও তার সাথীবৃন্দের ওপর আক্রমণ করে বসলো। হযরত হোসাইনের (রা) একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সাথীগণ, অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন। তাঁরা যেদিকেই আক্রমণ চালাতেন, সেদিক শত্রুমুক্ত হয়ে যেতো। এই পরিস্থিতি দেখে, ওরওয়াহ বিন কায়িস, ওমর বিন সাদের কাছে আরও সৈন্য তলব করলো এবং শীস্ বিন রাবীকে বললো যে, তুমি সামনে কেন অগ্রসর হচ্ছ না? শীস্ বললো, তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ। ইবনে আলী, যিনি বর্তমানে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তি তাঁর সাথে তোমরা যুদ্ধ করছ। আর ব্যভিচারিণী সুমাইয়ার পুত্র ইবনে যিয়াদের তোমরা সহযোগিতা করছ।

ওমর বিন সাদ পাঁচশত রিজার্ভ সৈন্য প্রেরণ করলো। তারা এসে যুদ্ধে শরীক হলো। হযরত হোসাইনের (রা) সাথীগণ অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে তাদেরও মোকাবিলা করলেন। অতঃপর তাদের পদাতিক বাহিনী ময়দানে এসে গেলো। এ সময়ও হুর বিন ইয়াযীদ ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে যিয়াদের সৈন্যবাহিনী দিশেহারা হয়ে শিবিরে আগুন লাগানো শুরু করলো।

প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যে জোহর নামায আদায়

হযরত হোসাইনের (রা) অধিকাংশ সাথীই শাহাদাত বরণ করলেন। এদিকে শত্রুবাহিনী হযরত হোসাইনের (রা) অতি নিকটে এসে পড়লো। আবু শামামা সায়েদী (রা) হযরত হোসাইনের (রা) কাছে আরয করলেন, আমার জীবন আপনার ওপর উৎসর্গিত, আমি আপনার সামনেই শহীদ হতে একান্ত আগ্রহী। কিন্তু আমার একান্ত বাসনা এই যে, জোহর নামাযের সময় উপস্থিত। এই নামায আদায় করে আমি আমার মহান প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে চলে যাবো। হযরত হোসাইন (রা) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যুদ্ধ স্থগিত রাখো। আমরা জোহর নামায আদায় করবো। কিন্তু ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে এই ঘোষণা কারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। উভয় দলই যুদ্ধে লিপ্ত। এ অবস্থায়ই আবু শামামা (রা) শাহাদাতের সুধা পান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে চলে গেলেন। অতঃপর হযরত হোসাইন (রা) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে জোহর নামায 'সালাতুল খাওফ'[১] অনুযায়ী আদায় করে নিলেন। নামায শেষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন। এর মধ্যে শত্রুপক্ষ হযরত হোসাইনের (রা)

টিকাঃ

১. সালাতুল খাওফ ঃ ভয়-ভীতি কালীন সময় নামায।

নিকটে এসে পৌছে গেলো। হানফী হযরত হোসাইনের (রা) সামনে এসে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শত্রুপক্ষের বিক্ষিপ্ত সব তীরগুলো নিজ বুকে বরণ করে নিতে লাগলেন। অবশেষে তিনি (হানফী) তীরের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

অতঃপর যোহায়ের বিন আল্‌কাইন (রা) হযরত হোসাইনের (রা) ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শত্রুদের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত হোসাইনের (রা) কাছে মাত্র অল্প সংখ্যক সাথী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, এই মুহূর্তে না হযরত হোসাইনকে (রা) রক্ষা করতে পারবে, না তারা নিজেরা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং তাঁরা সকলেই এই আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, আমরা প্রত্যেকেই হযরত হোসাইনের (রা) সামনে শহীদ হয়ে যাবো। এই সিদ্ধান্তের ওপর তাঁরা অটল থেকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলায় অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সময়, হযরত হোসাইনের (রা) বড় সাহেবজাদা (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আলী আকবর (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে অগ্রসর হলেন,

انا ابن علی الحسین بن علی # نحن ورب البیت اولی بالنبی

"আমি হোসাইন বিন আলীর পুত্র। কাবাগৃহে প্রতিপালকের কসম! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক নিকটবর্তী।"

পাপিষ্ঠ মুররাহ ইবনে মুনকায তাঁর ওপর তীর বর্ষণ করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলো। অতঃপর কতিপয় পাপিষ্ঠ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর মৃতদেহকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেললো। হযরত হোসাইন (রা) এই মৃতদেহের সামনে এসে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা সেই কওমকে বিনাস করুক, যারা তোমাকে এভাবে হত্যা করেছে। এই লোকেরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সম্পর্কে কতখানি নির্বোধ। অবশেষে তাঁর মৃতদেহ শিবিরে নিয়ে আসা হলো। ওমর বিন সাদ, কাসিম বিন হাসানের (রা) মাথার ওপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলো। এ আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময় কাসিমের (রা) যবান থেকে হে চাচা, আওয়াজ বেরিয়ে আসলো। এ আওয়াজ শুনেই হযরত হোসাইন (রা) দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরলেন এবং ওমর বিন সাদের ওপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করলেন। এ আক্রমণে তার হাত কনুই থেকে কেটে গেলো। হযরত হোসাইন (রা) তাঁর ভাতিজা কাসিমের (রা) মৃতদেহ নিজ কাঁধে করে শিবিরে নিয়ে এসে তাঁর পুত্র ও অন্যান্য আহলে বাইতের পাশে রেখে দেন। এখন হযরত হোসাইন (রা) সাথীহীন ও অসহায় অবস্থায় প্রায় একাই শিবিরে থেকে গেলেন। কিন্তু এ

অবস্থায়ও শত্রুপক্ষের কারও সাহস হচ্ছিলো না যে, তাঁর সামনে এসে আক্রমণ চালাবে। যে ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসে, সে আবার অনুরূপ ভাবেই ফিরে যান। কারণ, হযরত হোসাইনকে (রা) হত্যা করার দায়-দায়িত্ব এবং এর পাপ কেউই নিজ মাথায় বহন করতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কান্‌দাহ গোত্রের মালিক বিন নাসলি নামক এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে হযরত হোসাইনের (রা) মাথার ওপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলো। এ আঘাতে তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। এ সময় তিনি তাঁর ছোট সাহেবজাদা (কনিষ্ঠ পুত্র) আবদুল্লাহকে (রা) নিজ কোলে বসালেন। আসাদ গোত্রের এক পাপী এসে এই শিশু আব্দুল্লাহ (রা) ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। এতে শিশু আব্দুল্লাহ (রা) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হযরত হোসাইন (রা) এই নিষ্পাপ শিশুর রক্ত যমীনে বিছিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনিই এই জালিমদের প্রতিশোধ নিন। এ সময় হযরত হোসাইন (রা) অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তিনি পানি পান করার জন্য ফোরাত নদীর নিকটে তাশরীফ নিলেন। পাপিষ্ঠ অত্যাচারী হোসাইন বিন নোমায়ের হযরত হোসাইনের (রা) চেহারার দিকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করলো। এ তীরের আঘাতে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত

এরপরে শমর দশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরত হোসাইনের (রা) দিকে অগ্রসর হলো। হযরত হোসাইন (রা) ভীষণ তৃষ্ণার্ত ও আহত হওয়ার পরেও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। হযরত হোসাইন (রা) যে দিকেই অগ্রসর হতেন, ওরা সেদিক থেকেই ভেগে যেতো। ইতিহাস বিশারদগণ বলেন, এটা একটি অনন্য ঘটনা যে, যেই ব্যক্তি সন্তান এবং পরিবার হারা হয়েছেন, নিজে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পিপাসা মিটানোর জন্য এক ফোঁটা পানি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, সেই ব্যক্তি এই কঠিন অবস্থায়ও শত্রুর সাথে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এমনভাবে মোকাবিলা করতে লাগলেন যে, তিনি যেই দিকেই মুখ করেন সেই দিকের অস্ত্রধারী সৈন্যরাই ভেড়া-বকরীর মত পালিয়ে যেতে লাগলো। শমর যখন দেখলো হযরত হোসাইনকে হত্যা করা থেকে প্রত্যেকেই বেঁচে থাকতে চায়, তখন সে ডাক দিয়ে বললো তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাও। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে কতিপয় পাপিষ্ঠরা সামনে অগ্রসর হয়ে তীর ও তলোয়ার দ্বারা একজোটে হযরত হোসাইনের (রা) ওপর

আক্রমণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা, সে সময়ের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত হোসাইন (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে ওদের মোকাবিলা করে শাহাদত বরণ করেন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।"

শমর, খাওলী বিন ইয়াযীদকে হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র মস্তক কাটার জন্য বললো। সে সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু তার হাত কেঁপে গেলো। অতঃপর পাপিষ্ঠ সিনান বিন আনাস এই অন্যায় কাজটি সম্পন্ন করলো।

শাহাদত বরণ করার পরে হযরত হোসাইনের (রা) শরীরে তেত্রিশটি তীরের আঘাত এবং চৌত্রিশটি তলোয়ারের আঘাত দেখা গিয়েছিল। এই জালিমরা হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করার পরে আলী আসগরের দিকে মনোনিবেশ হলো। শমর তাঁকেও হত্যা করতে চাইলো। হুমায়দ বিন মুসলিম বললো, সুবহান আল্লাহ! তুমি অসুস্থ শিশুকেও হত্যা করতে চাও ? শমর তাঁকে ছেড়ে দিলে। ওমর বিন সাদ সামনে অগ্রসর হয়ে বললো, এই মহিলাদের শিবিরের কাছে যেন কেউ প্রবেশ না করে। এই অসুস্থ শিশুর ব্যাপারে কেউ যেন এগিয়ে না আসে।

মৃতদেহ পিষ্ট করা

পাপিষ্ঠ ইবনে যিয়াদের নির্দেশ ছিল যে, হযরত হোসাইনকে (রা) হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ যেন ঘোড়ার খুর দ্বারা পিষ্ট করা হয়। ওমর বিন সাদ কতিপয় সাওয়ারীকে এই কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলো। তারা এ জঘন্য ও অমানবিক কাজটিও করে ফেললো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

নিহতদের এবং শহীদগণের সংখ্যা

যুদ্ধের শেষে নিহতদের সংখ্যা গণনা করা হলো। এই যুদ্ধে হযরত হোসাইনের (রা) ৭২ জন সাথী শাহাদত বরণ করেন। আর ওমর বিন সাদের ২৮ জন সৈন্য নিহত হয়। হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর শহীদ সাথীগণকে এক দিন পর দাফন করা হলো।

হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের কর্তিত শির ইবনে যিয়াদের দরবারে

খাওলী বিন ইয়াযীদ ও হুমায়দ বিন মুসলিম শহীদগণের এই কর্তিত শির নিয়ে কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছে পেশ করলো। ইবনে যিয়াদ লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে এই শির উপস্থিত করলো। অতঃপর ইবনে যিয়াদ

একটি ছুরি হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র চেহারার ওপর রাখলে, যায়িদ বিন আরকাস (রা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠেন, হে ইবনে যিয়াদ! এই পবিত্র চেহারার ওপর থেকে ছুরি সরিয়ে ফেলুন। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই পবিত্র চেহরার ওপর চুমু খেতে দেখেছি। এই কথা বলে, তিনি কেঁদে দিলেন। ইবনে যিয়াদ বললো, হে যায়িদ! তুমি যদি বৃদ্ধ না হতে, তবে এই মুহূর্তে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। যায়িদ বিন আরকাস (রা) এই কথা বলে বাইরে চলে আসলেন যে, হে আরবের লোকেরা! তোমরা হযরত ফাতিমার (রা) পুত্রকে হত্যা করেছ এবং মারজানার পুত্রকে তোমাদের আমীর মনোনীত করেছ। মনে রেখো! সে তোমাদের ভাল লোকদেরকে হত্যা করবে এবং অন্যায়কারী ও দুষ্টদেরকে গোলাম বানিয়ে নিবে। তোমাদের কি হলো যে, এই অপমান ও লাঞ্ছনাকে তোমরা মেনে নিলে ?

বাকী আহলে বাইতগণের কুফায় আগমন ও ইবনে যিয়াদের সাথে কথোপকথন

দু'দিন পরে, ওমর বিন সাদ বাকী আহলে বাইত, হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা, বোন ও পুত্রদেরকে নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইলো। আহলে বাইতগণ এই করুণ দৃশ্য দেখে, কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের ক্রন্দন দেখে মনে হচ্ছে যেন, আকাশ ও পৃথিবীও ক্রন্দন করছে। ওমর বিন সাদ, আহলে বাইতগণকে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করলেন। হযরত হোসাইনের (রা) বোন যয়নব (রা) খুব ময়লা ও পুরাতন কাপড় পরিহিত অবস্থায় সেখানে পৌঁছলেন এবং এক পাশে গিয়ে নীরবে বসে রইলেন। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করলো, নীরবে এক পাশে বসে আছেন, ইনি কে ? যয়নব (রা) কোনই জবাব দিলেন না। কয়েক বার জিজ্ঞাসা করার পরেও যয়নব (রা) চুপ থাকলেন। এরপরে একজন দাসী বললো, ইনি যয়নব বিনতে ফাতিমা (রা)। একথা শুনে ইবনে যিয়াদ বললো, আল্লাহ তা'য়ালার শোকর! যিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, বিনাশ করেছেন এবং তোমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এ কথা শুনে, হযরত যয়নব (রা) উত্তেজিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার শোকর! যিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং আমাদের পবিত্রতার কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। লাঞ্ছিত সেই, যে আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হয়ে চলে।

একথা শুনে, ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের ক্রোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের ঔদ্ধত্যকে বিনাস করেছেন।

এ কথা শুনে, হযরত যয়নব (রা) কেঁদে দিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমাদের ছোট বড় সকলকে তুমি হত্যা করেছ। আর এই অমানবিক ও জঘন্য কাজকে তুমি তোমার জন্য মুক্তি মনে করছ ?

অতঃপর ইবনে যিয়াদ, আলী আসগরের (রা) দিকে ফিরে তাঁর নাম জিজ্ঞসা করলো। বলা হলো, এর নাম আলী। ইবনে যিয়াদ বললো, তাঁকে তো হত্যা করা হয়েছে। তখন আলী আসগর (রা) বললেন, তিনি হলেন আমার বড় ভাই। তাঁর নামও আলী (রা)। ইবনে যিয়াদ তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো। এ সময় আলী আসগর (রা) বললেন, আমাকে হত্যা করা হলে, আমার পরে এই পরিবারের দেখাশুনা কে করবেন ? এদিকে তাঁর ফুফু যয়নব (রা) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ইবনে যিয়াদকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে ইবনে যিয়াদ! এখনও তোমার পিপাসা মিটেনি ? আমাদের রক্ত আরও পান করতে চাও ? আমি তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, যদি একে তোমার হত্যা করতেই হয়, তবে এর সাথে আমাকেও হত্যা করো। অতঃপর আলী আসগর (রা) ইবনে যিয়াদকে বললেন, হে ইবনে যিয়াদ! আমাকে যদি হত্যা কর, তবে তুমি এই পরিবারের সাথে এমন এক মুত্তাকী ব্যক্তিকে প্রেরণ করবে, তিনি যেন ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। একথা শুনে ইবনে যিয়াদ তার লোকদেরকে বললো যে, এই বালককে ছেড়ে দাও। তিনি নিজেই তাঁর পরিবারের সাথে যাবেন।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ এক নামাযের পর ভাষণ দিলো। সে তার ভাষণে, হযরত হোসাইন ও হযরত আলীকে (রা) গালি-গালাজ করলো। সেই মজলিসে, আবদুল্লাহ বিন আফীফও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। সব সময়ই তিনি মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন; হে ইবনে যিয়াদ! তুমি মিথ্যুকের পুত্র মিথ্যুক। তুমি নবীর আওলাদকে হত্যা করেছ এবং সত্য পরায়নদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছ। ইবনে যিয়াদ তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর গোত্রীয় লোকদের কারণে গ্রেফতার করতে পারলো না।

হযরত হোসাইন (রা)-এর পবিত্র শির ইয়াযীদের কাছে প্রেরণ

ইবনে যিয়াদের অন্যায়, অমানবিক ও অশালীন আচরণ এখানেই সমাপ্তি হয়নি, বরং হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শিরকে একটি কাঠের ওপর রেখে কুফা বাজারের সর্বত্র ঘুরানোর জন্য সে তার লোকদেরকে নির্দেশ করলো। যাতে এসব লোকেরা এই শিরকে দেখতে পারে।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শির ইয়াযীদের কাছে সিরিয়ায় প্রেরণ করলো। এর সাথে বাকী আহলে বাইতগণকেও প্রেরণ করা হলো। তাঁদের সাথে দেয়া হলো, হুর বিন কায়িসকে। সে সিরিয়ায় পৌছেই পুরস্কারের লোভে অতিদ্রুত ইয়যীদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। ইয়াযীদ তাকে দেখে জিজ্ঞাস করলো, কি খবর ? হুর কারবালার করুণ কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করে বললো, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার জন্য সু-সংবাদ যে, আমরা বিজয় হয়েছি। বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের শির এবং তাঁদের স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের বাকী লোকদেরকে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি।

কারবালার এই মর্মান্তিক কাহিনী শুনে, ইয়াযীদের দু-চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। সে হুর বিন কায়িসকে বললো, আমিতো তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তাঁদেরকে হত্যা না করে শুধু গ্রেফতার করবে।

আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ সুমাইয়ার পুত্রের ওপর। সে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। খোদার কসম! আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি তাঁদেরকে ক্ষমা-সুন্দরের দৃষ্টিতে দেখতাম। আল্লাহ তা'য়ালা হোসাইনের (রা) ওপর অনুগ্রহ করুন। হুর বিন কায়িসকে ইয়াযীদ কোনই পুরস্কার প্রদান করলো না। হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শির, যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা হলো, তখন ইয়াযীদ তার হাতের ছুড়িটি হযরত হোসাইনের (রা) দাঁতের ওপর লাগিয়ে, হোসাইন বিন হাম্মামের কবিতাটি আবৃত্তি করলো।

الى قومنا ان ينصفو نا فانصت # فواضب فى ايا ننا تقطر الدما

يفلقن ها مامن رجال اعزة # علينا ولهم كانوا اعق واظزما

অর্থাৎ ঃ "আমার কওম আমার সাথে ইনসাফ করেনি। অতঃপর আমাদের রক্তপায়ী তরবারী ইনসাফ করেছে। যে তরবারী এমন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেছে, যে আমাদের ওপর কঠোর ছিল এবং সু-সম্পর্ক ছিন্নকারী জালিম ছিল।"

এ সময় আবু হারযাহ আসলামী (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইয়াযীদ! তুমি তোমার ছুড়ি হোসাইনের (রা) দাঁতের ওপর লাগাচ্ছ! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁকে চুমু খেতে দেখেছি।

হে ইয়াযীদ! কিয়ামতের দিন তুমি এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তোমার সুপারিশকারী ইবনে যিয়াদই হবে। আর হোসাইন (রা) এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে, তাঁর সুপারিশকারী হবেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এই কথা বলে, আবু হারযাহ (রা) মজলিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াযীদের ঘরে মৃত্যু শোক

ইয়াযীদের স্ত্রী হিন্দা বিনতে আবদুল্লাহ যখন হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের খবর এবং তাঁর কর্তিত শির ইয়াযীদের দরবারে নিয়ে আসার খবর শুনলেন, তখন তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি বাইরে এসে ইয়াযীদকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার পুত্রের সাথে এরূপ অমানবিক আচরণ করা হয়েছে? ইয়াযীদ বললো, হ্যাঁ। আল্লাহ ইবনে যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে নিজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। হিন্দা এই কথা শোনার পরে কেঁদে দিলেন।

অতঃপর ইয়াযীদ বললো, হোসাইন (রা) এই মন্তব্য করেছিলেন যে, "আমার পিতা ইয়াযীদের পিতার চাইতে এবং আমার মাতা ইয়াযীদের মাতার চাইতে এবং আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়াযীদের নানার চাইতে উত্তম।"

তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার কথা হচ্ছে এই যে, আমার পিতা উত্তম না তাঁর পিতা উত্তম, এর ফয়সালা আল্লাহর কাছেই। তিনিই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। তাঁরা উভয়ই আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছেন।

আর দ্বিতীয় মন্তব্যের ব্যাপারে, আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত। তাঁর মাতা, হযরত ফাতিমা (রা) আমার মাতার চাইতে অবশ্যই উত্তম।

তাঁর তৃতীয় মন্তব্যটি এমন একটি সঠিক মন্তব্য, যা কোন মুসলমান যার আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারে না।

হযরত হোসাইনের (রা) উপরক্ত সকল মন্তব্যসমূহ সত্য ও সঠিক। কিন্তু যেই বিপদ তাঁর ওপর এসেছে, তা এসেছে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ার কারণে। তিনি এই আয়াতের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল করেন নি।

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

"হে নবী আপনি বলুন! হে আল্লাহ, আপনিই রাজাধিরাজ। আপনি যাকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব দান করেন। আর যার থেকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব নিয়ে যান।"

অতঃপর হযরত হোসাইনের (রা) স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদেরকে ইয়াযীদের সামনে নিয়ে আসা হলো এবং সেই মজলিসে হযরত হোসাইনের (রা) শিরও রাখা হয়েছিল। হযরত হোসাইনের দুই কন্যা ফাতিমা (রা) ও সাকীনা (রা) আনত নয়নে তাঁদের শহীদ পিতার শির দেখতে চাইলেন। কিন্তু ইয়াযীদ তাঁদের কর্তিত শির দেখাতে রাজী ছিল না। যখন তাঁদের দৃষ্টি শহীদ পিতার শিরের প্রতি পড়লো, তখন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই খুব জোরে কেঁদে ফেললেন। তাঁদের ক্রন্দনের করুণ আওয়াজ শুনে ইয়াযীদের ঘরের মহিলারাও চীৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এ সময়, ইয়াযীদের প্রসাদে মৃত্যু শোকের এক ছায়া নেমে এলো।

ইয়াযীদের দরবারে যয়নব (রা)-এর বীরত্ব ব্যঞ্জক বক্তব্য

ইয়াযীদের দরবারে বসে এক সিরিয়াবাসী হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিল। তখন তাঁর ফুফু হযরত যয়নব (রা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হযরত হোসাইনের (রা) পরিবার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার অধিকার না তোমার আছে, না ইয়াযীদের আছে। একথায়, ইয়াযীদ রুষ্ট হয়ে বললো, সকল অধিকার আমার রয়েছে। যয়নব (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম! যতক্ষন পর্যন্ত তুমি আমাদের এই দ্বীন ও শরীয়ত প্রকাশ্যে ত্যাগ না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করার কোনই অধিকার তোমার নেই।" এ কথায় ইয়াযীদ আরও রুষ্ট হলো। হযরত যয়নব (রা) ইয়াযীদকে এরপরেও আরও কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। অবশেষে ইয়াযীদ চুপ হয়ে গেলো।

ইয়াযীদের গৃহে আহলে বাইতের মহিলাগণ

অতঃপর ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাগণকে অন্দর মহল্লায় তার ঘরে মহিলাদের কাছে প্রেরণ করলো। ইয়াযীদের ঘরের সকল মহিলারাই তাদেরকে দেখে ক্রন্দন করলো এবং শোক প্রকাশ করলো। তাদের থেকে, তাঁদের যেসব অলঙ্কারাদি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁর চেয়ে বেশি তাঁদেরকে প্রদান করা হলো।

ইয়াযীদের সামনে আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ)

অতঃপর আলী আসগরকে (রা) হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি অবস্থায় ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হলো। আলী আসগর (রা) ইয়াযীদের সামনে এসে বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় যদি আমাকে দেখতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার বাঁধনগুলো খুলে দিতেন।" ইয়াযীদ বললো, সত্যকথা। এই বলে সে বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল। অতঃপর আলী আসগর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাকে এভাবে মজলিসে বসা থাকা দেখতেন, তবে অবশ্যই তিনি তাঁর কাছে ডেকে নিতেন। এ কথা শুনে ইয়াযীদ তাঁকে তার কাছে ডেকে নিলো এবং বললো, হে আলী ইবনে হোসাইন (রা)! তোমার পিতাই আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং আমার প্রাপ্য আমাকে দেননি এবং আমার বাদশাহীর বিরোধিতা করেছেন। একারণেই, আল্লাহ তা'য়ালা এরূপ ব্যবস্থা করেছেন, যা তুমি আজ স্বচক্ষে দেখেছ।

এ কথার প্রেক্ষিতে, আলী আসগর (রা) কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে তাকে শুনালেন,

ما اصاب مو مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان تبرأها ان ذالك على الله يسير لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لايحب كل مختال فخور

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। (সূরা হাদীদ ঃ ২২-২৩)

ইয়াযীদ এই কথাশুনে চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর সে, আলী আসগর (রা)-কে এবং তাঁর পরিবারের সকল মহিলাদেরকে সতন্ত্র একটি গৃহে রাখার জন্য নির্দেশ দিলো। এরপর থেকে ইয়াযীদ প্রত্যহ নাস্তা ও খানা খাওয়ার সময় আলী বিন হোসাইনকে (রা) কাছে ডেকে নিত। একদিন তাঁর সাথে তাঁর ছোট ভাই আমর বিন হোসাইন (রা) চলে গেলেন। ইয়াযীদ আমর বিন হোসাইনের (রা) সাথে ঠাট্টা করে বললো যে, তুমি আমার এই ছেলে খালিদের সাথে মোকাবিলা করতে পারো ? আমর (রা) বললেন, হ্যাঁ পারি। তবে একটি শর্ত এই যে, আপনি তার কাছে একটি চাকু দিবেন আর আমার কাছে একটি চাকু দিবেন। একথা শুনে ইয়াযীদ বলল, "সর্পের বাচ্চা, সর্পই হয়ে থাকে।"

কোন কোন বর্ণনা মতে, ইয়াযীদ প্রথম থেকেই হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ব্যাপারে রাজী ছিল এবং তাঁর পবিত্র শির তার সামনে নিয়ে আসায় খুশীই হয়েছিল। কিন্তু যখন এই জঘন্য ও অমানবিক আচরণে, ইয়াযীদের কুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং সে (ইয়াযীদ) সকল মুসলমানদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেলো, তখন অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এবং বলতে লাগলো যে, হায়! আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে হোসাইনকে (রা) আমার সাথেই আমার গৃহে নিরাপদে রাখতাম। আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতাম। যদিও তিনি আমার অনুসরণকে অপছন্দ করেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এটাই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'য়ালা ইবনে মারজানার ওপর অভিশাপ করুন যে হোসাইনকে (রা) অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। অথচ তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে ইয়াযীদের কাছে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। অথবা কোন এক ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমি সেখানে পৌঁছে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারি। কিন্তু এই পাপিষ্ঠ নির্বোধ তা শুনেনি। সে তাঁকে হত্যা করে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের কাছে আমাকে ঘৃণিত করেছে। তাঁদের অন্তরে আমার সম্পর্কে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভাল-মন্দ সকলেই এখন আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। আল্লাহ এই ইবনে মারজানাকে অভিশপ্ত করুন।

আহলে বাইতগণের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইয়াযীদ আহলে বাইতগণকে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলো। সে নোমান বিন বাশীরকে নির্দেশ দিলো যে, তাঁদের মদীনায় যাওয়ার জন্য উত্তম সাওয়ারী প্রস্তুত করো। আর তাঁদের সাথে পথ প্রদর্শক হিসাবে একজন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তিকে দিয়ে দাও এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যও দিয়ে দাও, যারা তাঁদেরকে নিরাপদে মদীনা শরীফে পৌঁছিয়ে দিবে। বিদায়ের মুহূর্তে ইয়াযীদ, আলী বিন হোসাইনকে (রা) তার কাছে ডেকে নিয়ে বললো, আল্লাহ ইবনে মারজানার ওপর অভিশাপ করুন। আল্লাহর কসম, আমি যদি সেখানে (কারবালা প্রান্তরে) উপস্থিত থাকতাম, তবে হোসাইন (রা) যা কিছু বলতেন, আমি তা

মেনে নিতাম। আর তাঁকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। এতে যদি আমার পুত্রকেও প্রাণ দিতে হতো, তাতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করতাম না। কিন্তু যা ভাগ্যে ছিল তা ঘটে গেছে।

"হে সাহেবজাদা! তোমার যখন যা কিছুর প্রয়োজন হবে, আমাকে পত্রের মাধ্যমে জানাবে। তোমার সাথে যারা মদীনায় যাচ্ছেন, তাঁদেরকেও এই কথা বলে দিয়েছি।"[১]

অতঃপর আহলে বাইতগণ সৈন্যদের হেফাজতে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। হেফাজতকারীরা পথে বসে আহ্‌লে বাইতগণের আন্তরিকভাবে খেদমত করেছেন। রাতের বেলা তাঁদের সাওয়ারীকে অগ্রভাগে রেখেছে। যখন কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, তখন তাঁদেরকে আলাদা স্থান করে দিতেন এবং তাঁদের চারপাশে পাহারা দিতে থাকতেন। প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁদের যখন যা প্রয়োজন হতো, তা যথাযথভাবে আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ করতেন। অবশেষে তাঁরা নিরাপদে ও সম্মানে মদীনায় পৌছে গেলেন। মদীনায় পৌছে হযরত হোসাইনের (রা) কন্যা ফাতিমা (রা) হযরত যয়নবকে (রা) বললেন, এই লোকগুলো আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছে। এদেরকে কিছু উপহার দেয়া উচিত। যয়নব (রা) বললেন, এখন আমার কাছে এই নিজের অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তাঁরা দু'জনই তাঁদের অলঙ্কারাদি হতে দুটি স্বর্ণের কংকন এবং দুটি বাজু তাদের সামনে পেশ করলেন এবং তাঁদের কাছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু যে নেই, সে কথাটিও তাদেরকে বললেন। তারা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা যদি এই কাজ পার্থিব লক্ষ্যে করতাম, তবে এই উপহার আমাদের জন্য কম ছিল না। কিন্তু আমরা আমাদের সেই দায়িত্বই শুধু পালন করেছি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়ের জন্য আমাদের করণীয় ছিল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্ত্রীর পেরেশানী ও ইন্তেকাল

হযরত হোসাইন (রা)-এর স্ত্রী রিবাব বিনতে এমরুল কায়েসও এই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁকেও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সেখান থেকে তিনি মদীনায় পৌছেন। বাকী জীবন তিনি এভাবে কাটিয়েছিলেন যে,

টিকা ঃ

১. বিঃ দ্রঃ ইয়াযীদের এই অনুতপ্ততা এবং বাকী আহলে বাইয়াতগণের সাথে সুন্দর আচরণ, এটা কি তার কুখ্যাতি মিটানোর জন্য ছিলো, না প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভয়ে ছিলো এবং তার অন্তরে পরকালের ভয় সৃষ্টি হয়েছিলো কি না, তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু ইয়াযীদের পরবর্তী কার্যক্রম গুলো অত্যন্ত কলঙ্কময় ছিলো। শেষ মূহুর্তেও সে মক্কা শরীফ আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছিলো। আর এই অবস্থায়ই সে মারা যায়। তার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই খুব অবহিত।

কখনই তিনি ঘর থেকে বের হতেন না। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য কেউ প্রস্তাব দিলে বলতেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আর অন্য কাউকে শ্বশুর হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নই। এর এক বছর পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শাহাদতের খবর মদীনায় পৌছলে, গোটা মদীনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মদীনার সর্বত্র কান্নার রোল পড়ে যায়। সকলেই স্তিমিত ও পেরেশান হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন হযরত হোসাইনের (রা) বাকী পরিবার-পরিজন মদীনায় পৌছেন, তখন ব্যথিত, দুঃখিত ও মর্মাহত মদীনাবাসীদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

আবদুল্লাহ বিন জাফরকে সমবেদনা জ্ঞাপন

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফরের (রা) দুই পুত্র এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁদের শাহাদতের খবর শুনে বহু লোক হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফরকে (রা) সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এক ব্যক্তি বলে ফেললেন যে, হযরত হোসাইনের (রা) কারণেই আমাদের ওপর এই মসিবত এসেছে। একথা শুনে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তার দিকে জুতা নিক্ষেপ করে বললেন, আহম্মক! তুমি কি কথা বলছ ? আল্লাহর কসম! যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে হযরত হোসাইনের সাথে আমিও নিহত হতাম। আল্লাহর কসম! আজ আমার সন্তানদের শাহাদতই আমাকে প্রশান্তি দিচ্ছে যে, আমি যদিও হযরত হোসাইনের (রা) কোন সাহায্য করতে পারিনি, কিন্তু আমার সন্তানগণতো এই কাজটি করেছেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতে প্রকৃতির পরিবর্তন

ইবনে আমীরের বর্ণনা মতে, হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের পর থেকে দুই তিন মাস পর্যন্ত প্রকৃতির এই অবস্থা হয়েছিল যে, যখন সূর্যাস্ত যেত এবং সূর্যের কিরণ দরজা ও প্রাচীরে এসে পড়ত, তখন সূর্যের আলোটা এত লাল বর্ণের হতো, মনে হতো যেন প্রাচীর ও দরজাটি রক্ত দিয়ে প্রলেপ করা হয়েছে।

শাহাদতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্নে দেখা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন যে, দ্বিপ্রহরের সময়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং পেরেশান। তাঁর পবিত্র হাতে একটি শিশি। যার মধ্যে ছিল রক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর মধ্যে কি ? তিনি বললেন, হোসাইনের (রা) রক্ত। আমি এ রক্ত আল্লাহ তা'য়ালার সামনে পেশ করবো। হযরত আব্বাস (রা) এই

স্বপ্নটি দেখার পরেই, লোকদের কাছে বললেন যে, হযরত হোসাইন (রা) শহীদ হয়ে গেছেন। এই স্বপ্নের চৌদ্দ দিন পরেই, তাঁর শাহাদতের খবর এসে পৌছল। হিসাব করে দেখা গেলো যে, যেদিন হযরত আব্বাস (রা) স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেইদিনেই সেই সময়ই হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন। (বায়হাকী)

সালমী (রা) বলেন, একদিন আমি উম্মে সালমাহ্র (রা) কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি খুব কাঁদছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে স্বপ্নে দেখলাম যে, তাঁর পবিত্র মাথায় এবং দাড়ি মুবারকে ধুলো পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি অবস্থা ? তিনি বললেন, আমি এখন হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ওখানে উপস্থিত ছিলাম। (তিরমিযী)

হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে আবু নায়ীম কর্তৃক এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতে আমি জান্নাতকে ক্রন্দন করতে দেখেছি। (দালায়েল)

হযরত হোসাইন (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

হযরত হোসাইন (রা) হিজরী চতুর্থ সনের ৫ই শাবান মদিনা শরীফে ভূমিষ্ঠ হন এবং হিজরী ৬১ সনের ১০ই মুহাররম ৫৫ বসর বয়সে শাহাদত বরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর 'তাহ্নীক' নিজ হস্ত মুবারকে করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি খেজুর চিবিয়ে তার রস হযরত হোসাইনের (রা) মুখে নিজ হাতে দিয়েছেন এবং তাঁর কর্ণে তিনি আযানও দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর নাম হুসাইন রাখেন। সপ্তম দিবসে তাঁর আকীকা করা হয়। হযরত হোসাইন (রা) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বলেন—

حسين منى وانا من حسين "হোসাইন (রা) আমার থেকে। আর আমি হোসাইন (রা) থেকে।" اللهم احب حسينا "হে আল্লাহ! যে হোসাইনকে (রা) ভালবাসে, তাকে আপনি ভালবাসুন।"

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন—

من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه وفى لفظ شيد شباب اهل الجنه وفى لفظ شيد شباب اهل الجنة فلينظر الى حسين بن على -

"জান্নাতবাসীদের মধ্যে যদি কাউকে দেখতে চাও, অথবা এই কথা বলেছিলেন যে, জান্নাতী যুবকদের সর্দারকে যদি দেখতে চাও, তবে হোসাইন বিন আলীকে (রা) দেখে নাও।"

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে তাশরীফ রেখে বললেন, সেই ছেলেটি কোথায় ? অর্থাৎ হোসাইন (রা)। এ সময় হোসাইন (রা) এসে তাঁর কোলে বসে পড়লেন এবং তাঁর দাড়ি মুবারকে আঙ্গুলি প্রবেশ করাতে লাগলেন। তিনি হোসাইনের (রা) মুখে চুমু দিলেন এবং বললেন, আমি হোসাইনকে (রা) ভালবাসি। আর হোসাইনকে (রা) যে ভালবাসে তাকেও আমি ভালবাসি।

একবার ইবনে ওমর (রা) কাবার চত্বরে বসাছিলেন। তখন তিনি হযরত হোসাইনকে (রা) আসতে দেখে বললেন, "এই ব্যক্তি বর্তমানে, (অর্থাৎ এই সময় কালে) আকাশবাসীদের কাছে, পৃথিবীর মধ্যে অধিক প্রিয় ও পছন্দের ব্যক্তি।"

হযরত হোসাইন (রা) অত্যন্ত দানশীল ও অসহায় লোকদের সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর জান ও মাল মানব কল্যাণে উৎসাহিত ছিল। তিনি বলতেন, "আল্লাহর জন্য কারো অভাব পূরণ করা, এক মাসের ইতেকাফের চেয়ে উত্তম।"

হযরত হোসাইন (রা)-এর অমূল্য উপদেশ

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর অনুসারীগণকে সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, কোন মানুষ যদি কোন প্রয়োজনে তোমার কাছে আসে, তখন তুমি তাতে বিরক্ত হয়ো না। কারণ, তোমার কাছে তার প্রয়োজন (অভাব) নিয়ে আসাটা তোমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আর যদি তুমি এতে বিরক্ত ও বিষণ্ন হও, তবে এই অনুগ্রহ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাকে লোকের প্রতি মুখাপেক্ষী করানো হবে। তুমি তখন তাদের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে। হযরত হোসাইন (রা) একদিন মক্কার হরম শরীফে "হাজরে আসওয়াদ" ধরে এই দোয়া করতে ছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু আমাকে কৃতজ্ঞকারী হিসাবে পাননি। আমাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু আমাকে ধৈর্য্যশীল হিসাবে পাননি। এরপরেও আপনি আপনার অনুগ্রহ আমার থেকে সরিয়ে নেননি এবং আমাকে বিপদের সম্মুখীনও করেননি। হে আল্লাহ! আপনি মহা অনুগ্রহশীল। আর অনুগ্রহশীল থেকেইতো অনুগ্রহ হয়ে থাকে।"

হযরত হোসাইন (রা) তাঁর পিতা হযরত আলীর (রা) সাথে কুফায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ সময় হোসাইন (রা) তাঁর পিতার সান্নিধ্যেই ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করার পরে, হোসাইন (রা), তাঁর ভাই হযরত হাসানের (রা) সাথে থাকেন। হযরত হাসান (রা) কুফা ত্যাগ করে যখন মদীনায় চলে আসেন, তখন হযরত হোসাইনও (রা) তাঁর সাথে মদীনায় আসেন। ইয়াযীদের বাইয়াতের ফিতনা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। হযরত হোসাইনের (রা) সাথে কারবালা প্রান্তরে তেত্রিশজন আহলে বাইত শাহাদত বরণ করেন।

হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের বিভীষিকাময় পরিণাম

হযরত হোসাইন (রা) যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে এক ফোটা পানি সংগ্রহের জন্য ফোরাত নদীর কাছে গিয়েছিলেন তখন পাপিষ্ঠ হোসাইন বিন নোমায়ের তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিল। যা তাঁর পবিত্র মুখের ওপর গিয়ে লেগেছিল। এ সময় হযরত হোসাইনের (রা) যবান থেকে স্বাভাবিক ভাবেই তার জন্য বদ দোয়া বেরিয়ে আসলো যে, "হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার পুত্রের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে, আমি এর অভিযোগ আপনার কাছেই পেশ করলাম। হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে খন্ড-বিখন্ড করে দিন। তাদের কাউকেই বাকী রাখবেন না।"

একে তো মজলুমের বদ-দোয়া, এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওলাদ, এই বদ-দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। দোয়া কুবল হয়ে গেলো। পরকালের শাস্তির পূর্বেই এই পৃথিবীতেই তারা (হত্যাকারীরা) এক এক করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

ইমাম যহ্‌রী (রা) বলেন, যারা হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল তারা সকলেই পরকালের শাস্তির পূর্বে, এই পার্থিব জীবনে ভীষণ শাস্তি ভোগ করে নিহত হয়েছে। কারো কারো মুখমণ্ডল কালো কুৎসিত হয়ে গিয়েছিল কারো কারো চেহারা একেবারে সমান হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে চেনার কোন উপায় ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তারা রাজ্যচুত হয়েছে। এই পার্থিব শাস্তিই তাদের কু-কর্মের আসল শাস্তি নয়, বরং এটা ছিল পরকালীন মহাশাস্তির একটি নমুনা। যা মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পৃথিবীতে দেখানো হয়েছিল।

হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীর অন্ধ হওয়া

সাবত ইবনে জাওযী (র) বলেন, এক বৃদ্ধলোক হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল। সে অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে গেলো। লোকেরা তার কাছে এরূপ অকস্মাৎ অন্ধ হয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাবে সে বললো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে একখানা তরবারী এবং তাঁর সামনে চামড়ার একটি বিছানা। সেই বিছানার ওপর হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের মধ্য হতে দশ ব্যক্তির লাশ যবেহ করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অতঃপর তিনি (রা) আমাকে খুব ধমক দিলেন এবং হোসাইনের (রা) রক্ত মাখা একটি শলাকা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন। আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে দেখি, আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

মুখ কালো হয়ে যাওয়া

ইবনে জাওযী (র) বর্ণনা করেছেন, যে লোকটি হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শিরকে তার নিজ ঘোড়ার গর্দানে লটকিয়ে রেখেছিল, পরবর্তীতে দেখা গেলো যে, তার মুখ কালো কুৎসিত হয়ে গেছে। লোকেরা এর কারণ তার কাছে জিজ্ঞাস করলো যে, হে ভাই! গোটা আরবের মধ্যে তোমার চেহারা ছিল অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এখন এরূপ কালো হয়ে যাওয়ার কারণ কি? সে বললো, যেদিন থেকে আমি হোসাইনের (রা) শির আমার ঘোড়ার গর্দানে লটকিয়েছি, সে দিন থেকেই, যখনই আমি একটু নিদ্রায় যেতাম তখনই দু'ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে আমাকে এক প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে নিয়ে যেতো এবং তার মধ্যে নিক্ষেপ করত। এতে আমার চেহারা ঝলসে গিয়েছে। কিছু দিন পরে এই লোকটি এই অবস্থায়ই মারা যায়।

আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া

ইবনে জাওযী, সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দাওয়াত করেন। সেই দাওয়াতী মজলিসে এই আলোচনা হচ্ছিল যে, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় যারা শরীক ছিল তারা পৃথিবীতে অতিদ্রুত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তখন সেই দাওয়াতী ব্যক্তি বললো এই কথা আদৌ সত্য নয়। আমি নিজেই এই হত্যায় শরীক ছিলাম। আমার তো কিছুই হয় নি। এইবলে সেই ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে তার ঘরে চলে গেলো। ঘরে পৌছে ঘরের জ্বালানো প্রদীপটি ঠিক করতে গিয়েই অকস্মাৎ তার কাপড়ে আগুন লেগে গিয়ে সে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। সুদ্দী বলেন, আমি নিজে তাকে সকাল বেলা দেখেছি যে, সে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে।

পানি পানে বাধা প্রদানকারীর করুণ মৃত্যু

যে ব্যক্তি হযরত হোসাইনের (রা) ওপর তীর নিক্ষেপ করেছিল এবং পানি পানে বাধা দিয়েছিল, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা এমন তৃষ্ণার্ত করেছিলেন যে, সে যতই পানি পান করত, কিন্তু কোন ভাবেই সে তৃষ্ণা মিটাতে পারত না। তৃষ্ণায় সে ছটফট করত। শেষ পর্যন্ত পেট ফেটে গিয়ে করুণ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে।

ইয়াযীদের লাঞ্ছনাময় মৃত্যু

হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের পর থেকে, ইয়াযীদ একদিনের জন্যও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেনি। গোটা রাজ্যে হযরত হোসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদের শাহাদতের প্রতিশোধের জন্য বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ইয়াযীদের এই পার্থিব জীবনের অস্থায়ী ও কলংকময় নেতৃত্ব, হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের পর থেকে দু'বছর আট মাস, মতান্তরে তিন বসর আট মাসেব বেশি

থাকেনি। এই পৃথিবীতেও আল্লাহ তা'য়ালা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন এবং এই লাঞ্ছিত অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করেছে।

কুফায় মুখতারের কর্তৃত্ব এবং হযরত হোসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের করুণ মৃত্যু

হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীরা, আকাশ ও পৃথিবীর বিপদে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হতে লাগলো। কারবালার শাহাদতের পাঁচ বছর পরেই হিজরী ৬৬ সনে, মুখতার, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের থেকে কিসাস (হত্যার বিনিময়) নেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে সাধারণ মুসলমানগণ তার সাথে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মুখতার এতখানি শক্তি অর্জন করলেন যে, কুফা ও ইরাকে তার কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গেলো। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, হোসাইনের (রা) হত্যকারীদের ব্যতীত অন্য সকলকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। আর হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে বহু লোক লাগিয়ে দিলেন। তিনি এক একজনকে গ্রেফতার করে হত্যা করলেন। একদিনেই দুইশত আট চল্লিশ ব্যক্তিকে এই অপরাধে হত্যা করা হলো। তারা হযরত হোসাইনের (রা) হত্যায় শরীক ছিল। এর পরে বিশেষ অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা শুরু হলো।

আমর বিন হুজ্জাজ যোবায়দী তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পালিয়ে যেতে শুরু করলো। ভীষণ তৃষ্ণার্ত থাকার কারণে অচেতন হয়ে পড়ে গেলো। তাকে সেই অবস্থায়ই যবেহ করা হলো। হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অপরাধ ও অন্যায় করেছিল শিমর। তাকে হত্যা করে তার লাশ কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করে দেয়া হলো।

আবদুল্লাহ বিন উসায়দ জিহ্নী, মালিক বিন বাশীর এবং হামল বিন মালিককে গ্রেফতার করা হলো। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তারা নিজেরা আবেদন করল। মুখতার বললেন, হে জালিমেরা! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্রের প্রতি অনুগ্রহ করনি। এখন তোমাদের প্রতি কিভাবে অনুগ্রহ করা যায় ? অতঃপর সকলকে হত্যা করা হলো। মালিক বিন বাশীর হযরত হোসাইনের (রা) টুপি মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিল। এ কারণে, তার দুই হাত ও দুই পা কর্তন করে,তাকে ময়দানে ফেলে রাখা হয়েছিলো। অবশেষে সে ছটফট করতে করতে মারা গেল।

ওসমান বিন খালিদ এবং বাশর বিন শোমায়েত, মুসলিম বিন আকীলের (রা) হত্যায় সহায়তা করেছিল। তাদের দু'জনকে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আমার বিন সাদ, যে হযরত হোসাইনের (রা) মোকাবিলায় সৈন্য পরিচালনা করেছিল, তাকে হত্যা করে তার মাথা মুখতারের সামনে নিয়ে আসা

হলো। মুখতার, আমরের পুত্র হাফযকে পূর্ব থেকেই তাঁর দরবারে ডেকে এসে বসিয়ে রেখেছিলেন। যখন আমরের কর্তিত মাথা দরবারে নিয়ে আসা হলো, তখন মুখতার হাফযকে (রা) বললেন, তুমি কি জান, এই মাথাটি কার ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জানি। অতঃপর তাকেও হত্যা করা হলো। মুখতার বললেন, আমর বিন সাদকে হত্যা করা হয়েছে, হযরত হোসাইনের (রা) হত্যার বিনিময়ে। আর হাফযকে হত্যা করা হলো, আলী বিন হোসাইনের (রা) হত্যার বিনিময়ে। এর পরেও এই বিনিময় যথাযথ হয়নি। আমি যদি চারভাগের তিন ভাগ কুরায়শকে, হযরত হোসাইনের (রা) শাহাদতের বিনিময়ে হত্যা করে ফেলি, এরপরেও হযরত হোসাইনের (রা) একটি অঙ্গুলিরও প্রতিশোধ আদায় হয় না।

হাকিম বিন তোফায়েল, যে হযরত হোসাইনকে (রা) তীর মেরেছিল, তার শরীর তীর দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়া হলো। এতেই সে মারা গেছে। যায়েদ বিন রিফাদ, হযরত হোসাইনের (রা) ভাতিজা মুসলিম বিন আকীলের (রা) পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) তীর মেরেছিল। তাকে গ্রেফতার করে প্রথমে তার ওপর তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর জীবিত অবস্থায় তাকে জ্বালিয়ে দেয়া হলো।

সিনান বিন আনাস, যে হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র শির কর্তনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, সে কুফা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তার ঘর বিধ্বস্ত করে দেয়া হলো।

হযরত হোসাইনের (রা) হত্যাকারীদের এই বিভীষিকাময় ও করুণ পরিণামের ঘটনা শুনে, স্বাভাবিকভাবেই নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ যবানে এসে যায়।

كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر ولوكانوا يعلمون

"শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি এর চেয়ে ভীষণ। কতই না ভালো হতো! যদি তারা জানতো।"

অমঙ্গল ও জঘন্য প্রাসাদ

আবদুল মালিক বিন ওমায়ের লাইসী বলেন যে, আমি কুফার রাজপ্রাসাদে, আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে হযরত হোসাইনের (রা) কর্তিত শির, একটি ঢালের ওপর রক্ষিত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর সেই প্রাসাদেই আবদুল্লাহ বিন যিয়াদের কর্তিত শির, মুখতারের সামনে দেখেছি। এর পরে সেই প্রাসাদেই মুখতারের কর্তিত শির, মাসআব বিন যোবায়েরের সামনে দেখেছি। অতঃপর সেই স্থানেই মাসআব বিন যোবায়েরের শির আবদুল মালিকের সামনে দেখেছি। আমি এই ঘটনা, আবদুল মালিকের কাছে পেশ করলাম। তিনি এই প্রাসাদকে অমঙ্গল ও জঘন্য মনে করে এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। (তারীখে খোলাফা)

হযরত আবু হোরায়রা (রা) সম্ভবত এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি শেষ বয়সে এই দোয়া করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আমি ষাট

বছর এবং নবাগতদের নেতৃত্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" ষাট বছরের সময়ই ইয়াযীদের নেতৃত্ব শুরু হয় এবং ফিত্না ছড়িয়ে পড়ে। জালিম বেশি হলে, মাজলুমকে শারীরিক ভাবে ভীষণ নির্যাতন করতে পারে। এর বেশি আর নয়। কোন কবি বলেছেন,

پند اشت ستمگر که ستم بر ماکرد!
برگردن دے بماند وبرما بگذ شت

ভাবার্থ ঃ "জালিম অপরের উপর যে জুলুম করে, তা অবশ্যই বুঝে। কিন্তু এই জুলুম যে তার উপর প্রবর্তিত হবে তা বুঝে না।"

জালিমরা, যাদের ওপর নির্যাতন করেছে, যাদেরকে পৃথিবী থেকে বিনাশ করতে চেয়েছে, তারা (অত্যাচারিতগণ) প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। প্রতিটি ঘরে ঘরে তাঁদের সম্পর্কে উত্তম আলোচনা হয়ে থাকে। হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, মানুষ এখনও তাঁদের জন্য নিবেদিত এবং তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকেন। এ ঘটনায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয়ে থাকে। এই কারবালার ঘটনায়, সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ করে, যারা নেতৃত্বের নেশায় লিপ্ত হয়ে, জুলুম ও অন্যায়ের প্রতি আদৌ খেয়াল রাখে না, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট এক শিক্ষা ও উপদেশ।

হে জ্ঞানীগণ! উপদেশ গ্রহণ কর

সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে কখনো সত্যের আওয়াজ নির্বাপিত হয়ে যায় এবং সত্যপন্থীরা পরাজিত হয়। এতে অসত্য সত্য হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। অসত্য অসত্যই থেকে যায়। আর সত্য সর্বাবস্থায়ই সত্য থেকে যায়। দেখবে, পরিণামে কি দাঁড়ায়। পরিণামে, সত্যপন্থীরাই পুনরায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বিজয় লাভ করে থাকে।

হযরত হোসাইন (রা)-এর আদর্শ

যে কথা দিয়ে এ কিতাব লেখা শুরু করেছি, সেদিকেই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করছি। 'আহলে বাইয়াতের' প্রতি মহব্বত রাখাও ঈমানের অংশ। হযরত হোসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের, নিষ্ঠুর ও আমানবিক শাহাদতের ঘটনায়, যার অন্তর ব্যথিত ও দুঃখিত হবে না, সে মুসলমান তো দূরের কথা সে মানুষই নয়। তাঁদেরকে ভালবাসা এবং তাঁদের মসিবতে ব্যথিত হওয়ার অর্থ এই নহে যে সারা বছর আনন্দ উল্লাসে কাটিয়ে শুধু দশই মুহাররম শাহাদতের ঘটনাকে স্মরণ করে, আহজারী করবো, অথবা শোক প্রকাশ করে বড় ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো। আর তাঁদের প্রতি ভালাসার অর্থ এটাও নয় যে, সারা বছর

বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালে, কাউকেই পানি পান না করিয়ে শুধু মহররমের তারিখে, বর্ষাকাল বা শীতকাল হলেও, লোকদেরকে পানি পানের প্রয়োজন না হলেও, কারবালার শহীদগণের নামে পানি পান করাবো। বরং প্রকৃত ভালবাসা ও সমবেদনা হচ্ছে এই যে, যেই মহান উদ্দেশ্যে, হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছেন, সেই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী নিজকে কুরবানী করা। তাঁর চরিত্র ও আমলের অনুসরণ করাকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের জন্য খোশ নসীব মনে করা। তাঁর মহান উদ্দেশ্যগুলো যদি, এই পুস্তক থেকে কেউ একাগ্রতার সাথে পড়ে থাকেন, তবে তার অনুসরণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকবে না। স্মরণ রাখার জন্য, পুনরায় আমি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি।

যে উদ্দেশ্যে হযরত হোসাইন (রা) শাহাদত বরণ করেছেন

পূর্বের আলোচনায়, হযরত হোসাইনের (রা) বসরাবাসীর নামে প্রদত্ত পত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা পাঠকগণ! আপনারা পড়েছেন। সেই পত্রের কিছু অংশ আমি পুনরায় পেশ করছি।

"আপনরা দেখছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মিটে যাচ্ছে এবং বিদয়াত ছড়িয়ে পড়ছে। আমি আপনাদেরকে এই আহ্বান জানাচ্ছি যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর হিফাজত করুন এবং এর বিধান প্রচারের জন্য চেষ্টা করুন।"

কবি ফরযদকের জবাবে, যেই কথা তিনি কুফার রাস্তায় বসে বলেছিলেন, সে কথাও এ পুস্তকের পূর্ববর্তী আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তার কিছু কথা এই যে,

"আল্লাহর ইচ্ছা যদি আমার ইচ্ছার অনুকূলে হয়, তবে আল্লাহর শোকর আদায় করবো। আর এই শোকর আদায়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওফিক কামনা করবো। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা আমার ইচ্ছার অনুকূলে না হয়, তবে এতে সেই ব্যক্তির কোনই অপরাধ নেই, যার নিয়ত শুদ্ধ এবং যার অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে।" (ইবনে আসীর)

হযরত হোসাইন (রা) যুদ্ধের ময়দানে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, সে ভাষণটিও খুব একাগ্রতার সাথে পাঠ করে দেখুন, যাতে জালিম ও অন্যায়কারীদের মোকাবিলায় শুধু আল্লাহর জন্যই তাঁর স্থির থাকার কথা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধের ময়দানের তৃতীয় ভাষণে এবং এরপরে হুর বিন ইয়াযীদের এক জবাবে, তিনি এক সাহাবীর কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন। যার কিছু কথা এই যে, "মৃত্যু কোন যুবকের জন্য খারাপ নয়, যখন তার নিয়ত (উদ্দেশ্যে) সৎ থাকে এবং মুসলমান অবস্থায় যুদ্ধ করে।"

প্রচন্ড যুদ্ধের সময়, হযরত হোসাইনের (রা) স্বপ্নের কথা শুনে, তাঁর সাহেবজাদা আলী আকবরের (রা) এই কথা বলা যে, "আব্বাজান! আমরা কি সত্যের ওপর নই?" তিনি বললেন "সেই মহান সত্তার শপথ! যার কাছে সকল বান্দার প্রত্যাবর্তন করতে হবে, নিশ্চয়ই আমরা সত্যের ওপর রয়েছি।"

আহলে বাইতের সামনে হযরত হোসাইনের (রা) শেষ কথাগুলো পুনঃরায় পাঠকের সামনে পেশ করছি।

"আমি আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করি, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই। হে আল্লাহ! আমি আপনার শোকর আদায় করছি, আপনি মেহেরবানী করে, আমাকে কর্ণ ও অন্তর দান করেছেন, যা দ্বারা আমি আপনার আয়াত বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আর আপনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং দ্বীনের বুঝ দান করেছেন। আপনি আমাকে আপনার কৃতজ্ঞশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

এই ভাষণ শোনার পরেও, কোন মুসলমানের কি এই সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত হোসাইনের (রা) এই জিহাদ ও বিস্ময়কর কুরবানী ছিল রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের জন্য ?

তারা বড়ই জালিম, যারা এই সম্মানিত ও বুযুর্গ ব্যক্তির কুরবানী সম্পর্কে এই কথা বলে থাকে যে, এটি ছিল পার্থিব সম্মান ও নেতৃত্বের জন্য।

শুরুতে যে কথা বলেছি, পুনরায় সে কথাই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, হযরত হোসাইনের (রা) জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে—১. কিতাব ও সুন্নাহর বিধান যথাযথভাবে চালু করা। ২. ইসলামী ইনসাফ সর্বত্র কায়েম করা। ৩. ইসলামে, খেলাফতে নুবওয়াতের পরিবর্তে বাদশাহী ও আমিরী শাসনের মোকাবিলা করা। ৪. সত্যের মোকাবিলায় কোন শক্তির সামনে ভীত না হওয়া। ৫. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় প্রাণ, সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ প্রতিবন্ধক না হওয়া। ৬. সকল বিপদ-আপদে ও কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁর ওপরই ভরসা করা। ৭. কঠিন বিপদেও আল্লাহ তা'য়ালার শোকর করা। এমন কেউ আছে কি ? যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হোসাইনের (রা) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক ভাবে প্রস্তুত এবং তাঁর আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ?

"হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনার ও আপনার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর সাহাবা ও আহলে বাইতগণের পুরোপুরি অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।" আমীন।